আল কুরআন এক মহাবিস্ময়

মূল

ড. মরিস বুকাইলি
ড. কিথ এল. মূর
গ্যারি মিলার

অনুবাদ ও সম্পাদনা
খোন্দকার রোকনুজ্জামান

আল কুরআন ঃ এক মহাবিস্ময়

মূল

ডঃ মরিস বুকাইলি

ডঃ কিথ এল. মূর

গ্যারি মিলার

অনুবাদ

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-843-035-x

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মুহাররাম ১৪৩২
পৌষ ১৪১৭
জানুয়ারী ২০১১

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Al Quran : Ek Mohabismoy Edited by Khondokar Rokonuzzaman Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition November 2008 2nd Edition January 2011 Price Taka 50.00 only.

সূচীপত্র ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

'আল কুরআন ঃ এক মহাবিস্ময়' বইটিতে প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ আল কুরআনকে আধুনিক বিজ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার বটে। একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক; একটি দাবী করে বিশ্বাস, অন্যটির দাবী প্রমাণ। অথচ অবাক করা ব্যাপার হল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরা একে অন্যের চোখের গভীরে নিজেকেই পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে।

বইটি আকারে ছোট; কিন্তু লেখকত্রয়ের পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির নমুনা এর প্রতিটি পাতায় ভাস্বর। ডঃ বুকাইলি, ডঃ মূর ও গ্যারি মিলার এমন সমাজে জন্মেছেন ও লালিত হয়েছেন, যেখানে বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন উড়েছে বহুকাল আগে। সে সমাজে কোন কিছু গ্রহণ করার আগে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়; ধর্ম-বিশ্বাসকেও এর ঊর্ধ্বে মনে করা হয় না। এই বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার সাহায্যে তাঁরা আল-কুরআনকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলাফল যা এসেছে, তাকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সততা দিয়ে মেনেও নিয়েছেন।

আল কুরআন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার শুরুতেই কয়েকটি বিষয় ভালমত বুঝে নেয়া দরকার।

প্রথমতঃ আল কুরআন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয়। এটি মূলতঃ ইহলৌকিক জীবন-পথের দিশা ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকনির্দেশনা দানকারী গ্রন্থ। অতএব, এতে বৈজ্ঞানিক তথ্য সেভাবে আশা করা ভুল হবে, যেভাবে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রে তা উল্লেখিত হয়। এই মহাগ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য এসেছে মূলতঃ সৃষ্টি জগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর কুদরত ও সৃষ্টিকুশলতার উল্লেখ প্রসঙ্গে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আর তাদের পথনির্দেশ দিতে অল্প কথায় বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করা হয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধির দাবী তো এটিই। যে গ্রন্থ শত-সহস্র বছর ধরে পঠিত হবে, যে গ্রন্থের পাঠক শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত লোক, বিজ্ঞান-বাণিজ্য-কলার ছাত্র-ছাত্রী, সে গ্রন্থে বিজ্ঞানের জটিল বিশ্লেষণ কাম্য হতে পারে কি?

দ্বিতীয়তঃ আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংক্ষিপ্ত হলেও মোটেই অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক নয়। অন্তরের সমস্ত অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে মুক্তমনে এসব আয়াত পাঠ করলে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে যা বলা হয়েছে তা

পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে। কোনরূপ গোঁজামিলের নামগন্ধও এখানে নেই। নিচের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করলেই পাঠক এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন ঃ

'পথবিশিষ্ট আসমানের কসম।' (সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ০৭)

'আকাশমণ্ডল আমি আপন ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি আর নিশ্চয় আমি তা সম্প্রসারিত করছি।' (সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৪৭)

'আল্লাহ্ সমস্ত প্রকার প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।' (সূরা আন্ নূর ঃ ৪৫)

তৃতীয়তঃ আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর মধ্যে এমনও অনেক আছে যেগুলি বিংশ শতাব্দীর আগে বিজ্ঞানের জগতেও অজানা ছিল। আসলে এগুলি প্রমাণের জন্য এমন সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন ছিল যা আবিষ্কৃত হয়েছে অল্পকাল আগে। উদাহরণ স্বরূপ, ভ্রূণের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন যা খুব বেশি কাল আগের আবিষ্কার নয়। তেমনিভাবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন ছিল অতি ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের। এটি (হাবল টেলিস্কোপ) আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীতে, ১৯২৯ সালে। এমন আরো তথ্য আছে যেগুলি জানতে কম্পিউটার, সাবমেরিন, সি,টি স্ক্যানারের মত অত্যাধুনিক যন্ত্র প্রয়োজন। অথচ এসব যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই একজন নিরক্ষর মরুচারী প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই তথ্যগুলি জেনে গেলেন। বিষয়টি কি বিস্ময়কর নয়? ভাবনা জাগানিয়া নয়?

ডঃ মরিস বুকাইলির গবেষণামূলক গ্রন্থ The Bible The Quran and Science যখন প্রকাশিত হয়, তখন পৃথিবীব্যাপী চিন্তাশীল মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বইটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যেও গুঞ্জন চলতে থাকে। এমতাবস্থায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তিনি। সেই লক্ষ্যে ফরাসি চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের একাডেমিতে তিনি এক বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি যা বলেছিলেন, তা-ই স্থান পেয়েছে এই পুস্তিকায়।

বিজ্ঞানী হবার কারণে বুকাইলি তাঁর গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছেন। আল কুরআনের যেসব আয়াতে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলিকে তিনি প্রথমে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করেছেন যেমন

মহাবিশ্ব সৃষ্টি, পৃথিবী সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ইত্যাদি। এরপর তিনি সেই আয়াতগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এভাবে তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন, আল কুরআন এক অলৌকিক মহাগ্রন্থ। উল্লেখ্য, বুকাইলি তাঁর আলোচনায় এমন কোন মতবাদকে স্থান দেননি, যা বিজ্ঞানের নামে টিকে থাকলেও আজও প্রমাণিত হয়নি।

পরিশেষে, বুকাইলি বাইবেল ও আল কুরআনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই সাথে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তিনি উভয় ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ দু'টিকে যাচাই করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বসৃষ্টি, নূহ (আ)-এর সময়কার বন্যা এবং ফেরাউনের ডুবে মরার ঘটনার বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এসব বিষয়ের উপর বাইবেলের বর্ণনা যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, সেখানে আল কুরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। এভাবে তিনি প্রমাণ করেছেন, যুগ যুগ ধরে খৃস্টানরা যে দাবী করে আসছে, বাইবেল থেকে প্রেরণা নিয়ে আল কুরআন রচিত হয়েছিল, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। তাছাড়া তিনি এটাও দেখিয়েছেন, প্রাচীন কালের লোকদের মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে কত ভুল ধারণা আর কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। অথচ সেই প্রাচীন কালের গ্রন্থ আল কুরআনে সেসব ভুল ধারণা বা কুসংস্কারের চিহ্নমাত্র নেই। এ প্রসঙ্গে ডঃ বুকাইলি তাঁর The Bible The Quran and Science গ্রন্থে বলেছেন—

"The Quran does not contain a single statement that is assailable from a modern scientific point of view."

অর্থাৎ— কুরআনে এমন একটি বক্তব্যও নেই যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণযোগ্য।

ডঃ কীথ এল মূর তাঁর আলোচনা ভ্রূণতত্ত্বের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কুরআনের এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলির তিনি একের পর এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাছাড়া, ভ্রূণ বিকাশের বিভিন্ন স্তর বুঝাতে আল কুরআনে যেসব জিনিসের উপমা দেওয়া হয়েছে, সেসব তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং আল কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। তিনি নিজে বিস্মিত হয়েছেন উপমিতের সাথে উপমানের আকারগত সাদৃশ্য দেখে। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে তিনি এদের ছবি পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন। ডঃ মূর ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জ্ঞানের এই বিশেষ শাখা যেহেতু অণুবীক্ষণ যন্ত্রনির্ভর, সেহেতু এক্ষেত্রে সত্যিকার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে অল্পকাল আগে। ১৯৭২ সালের আগে এক্ষেত্রে মানুষ নির্ভুল জ্ঞান লাভ করেনি।

গ্যারি মিলার। কানাডার খ্যাতিমান সাংবাদিক তিনি। তাঁর লেখনীতে সাংবাদিকের চিত্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গী রয়েছে। তাঁর আলোচিত বিষয়গুলির কয়েকটি অন্যের গবেষণা; মিলারের কিছু মৌলিক গবেষণাও স্থান পেয়েছে এতে। এর মধ্যে রয়েছে- টাইম জোন, মৌমাছির লিঙ্গ নির্ণয়, সম্ভাব্যতার সূত্র প্রয়োগ করে আল কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করণ সম্পর্কিত আয়াতের প্রয়োগ। আল কুরআন যাদের কাছে আসমানি বাণী বলে বিবেচিত, এই প্রবন্ধ তাদের বিশ্বাসের ভিত আরো মজবুত করে দেবে। যারা বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের টানাপোড়েনে হয়রান-পেরেশান, আশা করা যায়, এই প্রবন্ধ তাদের দোদুল্যমানতা দূর করতে পারবে। যারা নিজেদেরকে মুক্তচিন্তার ধারক বলে দাবী করেন, তাদের দাবী যথার্থ হলে এটি তাদেরকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে।

লেখক আল কুরআনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ভালমতই যাচাই করে দেখিয়েছেন। যেসব তথ্য তিনি উপস্থাপন করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতিক্ষুদ্র এককোষী জাইগোটের ক্রমান্বয়ে বিকাশলাভ, টাইম জোন, একক জড়পিণ্ড থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পানি থেকে জীবের সৃষ্টি, আপন অক্ষের উপর সূর্যের ঘূর্ণন, সোলার এপেক্সে সূর্যের ছুটে চলা, কর্মী মৌমাছির লিঙ্গ— প্রভৃতি বিষয়গুলি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে এই বিষয়গুলি প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সুস্পষ্ট এবং নির্ভুলভাবে আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। ভাল হত, কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক আরো যেসব আয়াত আছে (সংখ্যায় যা বিপুল) সেগুলি যদি লেখক আলোচনায় আনতেন।

গ্যারি মিলার বস্তুনিষ্ঠ সম্ভাব্যতার সূত্র প্রয়োগ করেও আল কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করেছেন। এই সূত্র বলেঃ অনুমানের বিষয় এবং তার প্রতিটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ অনুমানের বিষয় যত বৃদ্ধি পাবে, প্রতিটিতে নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত কমবে। এই সূত্র প্রয়োগ করে তিনি দেখিয়েছেন, আল কুরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী নিছক অনুমানের ফসল হওয়া কতই না অসম্ভব।

পুস্তকটি পাঠকালে বিদগ্ধ পাঠক উপলব্ধি করবেন, লেখকত্রয় কত সহজে বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে পেরেছেন। তাঁরা পাঠককেও এই অতলযাত্রায় সঙ্গী করতে পেরেছেন। এটি চিন্তাশীল মনে অনিবার্য প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস। ■

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

ডঃ মরিস বুকাইলি

১৯৭৬ সালের ৯ নভেম্বর ফ্রান্সের একাডেমি অব মেডিসিন-এ এক ভিন্ন ধারার বক্তৃতা দেওয়া হয়। এটির শিরোনাম ছিল- 'আল কুরআনে শরীরতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য'। শরীরতত্ত্ব ও প্রজনন সম্পর্কিত আল কুরআনের বর্ণনার উপর আমি আমার গবেষণা উপস্থাপন করেছিলাম। আমি এটা এই কারণে করেছিলাম যে, জ্ঞানের এই দু'টি শাখা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি আধুনিক যুগের আবিষ্কারের মাধ্যমে। আল কুরআনের সময়কালের একটা গ্রন্থে (অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে) কিভাবে এই বিষয়গুলি থাকতে পারে তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

আধুনিক যুগের আগে মানুষের রচিত এমন কোন গ্রন্থ ছিল না যা রচনাকালের তুলনায় অনেক অগ্রসর বক্তব্য ধারণ করে এবং যাকে আল কুরআনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও, বাইবেলে (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) বর্ণিত একই ধরণের বর্ণনার (অর্থাৎ- শরীরতত্ত্ব ও প্রজনন বিষয়ক বর্ণনার) তুলনামূলক আলোচনা কাম্য মনে হয়েছিল । এভাবেই আধুনিক জ্ঞান আর একেশ্বরবাদীদের ধর্মগ্রন্থের কিছু অনুচ্ছেদকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রকল্পটি গঠন করা হয়েছিল। এটি ছিল বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান (The Bible, the Quran and Science) নামক গ্রন্থ প্রকাশের ফল। বইটির প্রথম ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের মে মাসে (সেঘার্স, প্যারিস)। এখন ইংরেজী ও আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ।[১]

---

১. দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সায়েন্স ঃ এই অসাধারণ গবেষণামূলক গ্রন্থটি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আখতার-উল-আলম। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন। পরে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে অনেকবার পুনঃমুদ্রণ হয়েছে। প্রীতি প্রকাশন থেকে ওসমান গনী নামক আরেক বিদগ্ধ সাংবাদিকের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বইটি চিন্তাশীল পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। -অনুবাদক।

এটি জেনে অবাক হবেন না যে, ইসলামে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে সব সময় জময বোন ভাবা হয়ে আসছে । আজকের দিনে যখন বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর হয়েছে, তখনও তারা (অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ইসলাম) সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাছাড়া, আল কুরআনের বাণীকে ভালমত বুঝার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরো কথা হল, এই শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক সত্য যখন অনেকের ধর্মীয় বিশ্বাসে মরণ আঘাত হানছে, তখনও বিজ্ঞানের ঠিক সেই আবিষ্কারই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে, ইসলামী প্রত্যাদেশের (অর্থাৎ-ওহীর) অলৌকিকত্বকে সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে- সব কথা আলোচনার পরে মনে হবে, বিজ্ঞানের জ্ঞান আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে খুবই সহায়ক, যদিও লোকেরা ভিন্ন কথা বলে থাকে । আমরা নিজেদেরকে অধিবিদ্যার পাঠ সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্তভাবে প্রশ্ন শুরু করতে পারি। আমাদের প্রশ্নের বিষয় হবে আজকের জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত (যেমন, অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে কিংবা জীবন সমস্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান)। এটা করা হলে আমরা এসব পথে চিন্তা করার অনেক কারণ আবিষ্কার করতে পারি । জীবনের আরম্ভ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সত্তা সম্পর্কে অমরা চিন্তা করতে পারি । স্পষ্টতঃ আকস্মিক ঘটনার ফল স্বরূপ জীবনের অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা অবশ্যই হ্রাস পেতে থাকে। কিছু ধারণা ক্রমবর্ধমান-ভাবে অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, সেই ধারণার কথা বলা যায় যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী বিজ্ঞানী পেশ করেছিলন। তিনি লোকদেরকে স্বীকার করাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, জীবন্ত বস্তু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে আকস্মিকভাবে বাইরের কিছু প্রভাবের কারণে। এটার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সরল রাসায়নিক উপাদান । এটা থেকে দাবি করা হয় যে, জীবন্ত প্রাণী অস্তিত্ব লাভ করেছিল আর সেই প্রক্রিয়ায় আবির্ভাব ঘটেছে অসামান্য জটিল মানুষের । আমার কাছে মনে হত, উচ্চতর প্রাণীর অদ্ভুত জটিলতা বুঝার জন্য বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা আসলে পরিকল্পিত সৃষ্টি মতবাদের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি সরবরাহ করে । অন্য কথায় বলতে

গেলে, প্রাণের উদ্ভব ঘটার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল[২] অসাধারণ পদ্ধতিগত কাঠামোর অস্তিত্ব । কুরআনের অনেক স্থানে সহজ ভাষায় এই ধরণের সাধারণ ভাবনার পথ দেখানো হয়েছে । কিন্তু এই গ্রন্থে অপরিসীম যথার্থ তথ্যাবলী রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত : এগুলি সেই জিনিস যা আজকের বিজ্ঞানীদেরকে চুম্বকের মত আর্কষণ করে।

কুরআন বুঝতে বিশ্বকোষের জ্ঞান প্রয়োজন : অনেক শতাব্দী ধরে মানুষ এসব বুঝতে পারেনি, কারণ তার কাছে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ছিল না । কেবলমাত্র আজকের দিনে কুরআনের অসংখ্য আয়াত (যাতে প্রাকৃতিক জগতের আলোচনা করা হয়েছে) পুরাপুরি বোধগম্য হয়েছে । আমি তো এতদূরও বলা উচিত মনে করি যে, বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের অবিরাম বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সাধারণ বিজ্ঞানীদের জন্যও কুরআনের সবটা বুঝতে পারাটা সবসময় সহজ নয়। এজন্য এসব বিষয়ে গবেষণামূলক কোর্স করে তাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তার অর্থ হল- কুরআনের এই ধরণের সকল আয়াত বুঝার জন্য আজ একজনের প্রয়োজন নির্ভেজাল বিশ্বকোষের জ্ঞান, আমি বুঝাতে চাচ্ছি, এমন কিছু যা অনেক রকম জ্ঞানকে ধারণ করে। আমি 'বিজ্ঞান' শব্দটা ব্যবহার করছি সেই জ্ঞানকে বুঝাতে যা ভালোমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর মধ্যে সেসব মতবাদ অন্তর্ভুক্ত নয় যা কিছুকালের জন্য, একটা বা একগুচ্ছ বিষয় বুঝতে সাহায্য

---

২. প্রাণের উদ্ভব কি আকস্মিক? প্রাণহীন প্রোটিন অণুতে থাকে পাঁচটি মৌলিক উপাদান ঃ কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার। ১১২টি মৌলিক পদার্থ থেকে এগুলি পৃথক হয়ে যাওয়া এবং যথাযথ মাত্রায় মিলিত হয়ে প্রোটিন অণু গঠন করার সম্ভাবনা কতটুকু তা হিসাব করা সম্ভব। কাজটি করেছেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত গণিতবিদ চার্লস ইউজিন গাই। তিনি দেখিয়েছেন, আকস্মিকভাবে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা যদি হয় ১, তাহলে না ঘটার সম্ভাবনা হল ১ এর পরে ১৬০টি শূন্য বসালে যে সুবিশাল সংখ্যা পাওয়া যায় সেটি। এবার সময়ের হিসাব কষা যাক। বিজ্ঞানী গাইয়ের হিসাব বলে, প্রোটিনের এরকম একটি অণু সৃষ্টির জন্য যে সময় প্রয়োজন, তা পৃথিবীর বয়সের চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি। ১ এর পরে ২৪৩টি শূন্য বসালে যে অকল্পনীয় এবং ভাষায় প্রকাশের অতীত সংখ্যা পাওয়া যায়, তত বছর লাগবে একাজে। পাঠক ভেবে দেখুন, ১ এর পরে মাত্র ১০টি শূন্য বসালে সংখ্যাটি হয় এক হাজার কোটি। তাহলে আকস্মিকভাবে একটি প্রোটিন অণু গঠনের সম্ভাবনা কতই-না কম। এখানেই শেষ নয়। যদি এই অসম্ভব ব্যাপারটি কোন মহাজ্ঞানী সত্তার মহাপরিকল্পনায় না ঘটে তথাকথিত আকস্মিকভাবে ঘটেও যায়, তাহলে আমরা পাবো একটি প্রোটিন অণু । এটি জীবকোষের অপরিহার্য উপাদান হলেও নিজে কিন্তু প্রাণহীন। রহস্যময় প্রাণ এতে কিভাবে এল তার হিসাব কিন্তু অবিশ্বাসীরা দিতে পারেনি। —অনুবাদক।

করে। আর পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কল্যাণে অর্জিত আর মনোহর ব্যাখ্যার দাপটে পরিত্যক্ত হয়ে যায় । আমি মূলত: কুরআনের বক্তব্যের সাথে সেই জ্ঞানের তুলনা করতে ইচ্ছা করি যা আর পর্যালোচনার অধীন হবার সম্ভাবনা নেই । আমি যেখানে এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করি যা এখনো ১০০ ভাগ প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে আমি অবশ্যই এটা একেবারে পরিষ্কার করে দেব।

কুরআনে এমন কিছু দুর্লভ বক্তব্যের উদাহরণও আছে, যা এখনও আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিত হয়নি। আমি এ গুলির উল্লেখ করে দেখিয়ে দেব যে, সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ এগুলিকে খুবই সম্ভব বলে মনে করতে বিজ্ঞানীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এরকম একটি উদাহরণ হল কুরআনের সেই বক্তব্য যে, জীবনের উৎস পানি। আরেকটি বক্তব্য হল, মহাবিশ্বের কোথাও কোথাও আমাদের পৃথিবীর মত জগত আছে।

এসব বৈজ্ঞানিক বিবেচনা থেকে আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, কুরআন বিশেষভাবেই একটি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে রয়ে গেছে। এটা অবশ্যই আশা করা যায় না যে, এর নিজস্ব বৈশিষ্টে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য থাকবে । যখনই মানুষকে সৃষ্টি-রহস্য আর তার দেখা অসংখ্য প্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে ভাবতে আহ্বান করা হয়, তখন এসব উদাহরণ ব্যবহারের সুস্পষ্ট লক্ষ্য হল খোদায়ী সর্বশক্তির উপর জোর প্রদান। বাস্তবতা হল, এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা খুঁজে পাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্যের উল্লেখ। এটি অবশ্যই আল্লাহর আরেকটি দান। এই দানের মূল্য নিশ্চয় এমন এক যুগে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে, যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর বস্তুবাদী নাস্তিকতা আল্লাহতে বিশ্বাসের বিকল্প হিসেবে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায়।

আমার গবেষণার শুরু থেকে শেষ অবধি আমি সর্বক্ষণ চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে । আমার বিশ্বাস, আমি সেই ধরণের নিরপেক্ষতা নিয়ে কুরআনের মুখোমুখি হতে পেরেছি, যেভাবে একজন চিকিৎসক কোন রোগীর বিবরণ-ফাইল খুলে দেখেন। অন্য কথায়, সবগুলো লক্ষণ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে তিনি রোগ নির্ণয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, প্রথম পথনির্দেশ আমি ইসলামের প্রতি

বিশ্বাস থেকে লাভ করিনি, বরং সত্যের সরল গবেষণার আগ্রহ থেকে পেয়েছি। এভাবেই আজকে আমি এটা দেখে থাকি। এটা ছিল মূলত: সেই বাস্তবতা যা আমার অধ্যয়নের শেষ পর্যায়ে আমাকে পথ দেখিয়েছিল একজন নবীর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ কুরআনের একটি বর্ণনা দেখতে।

আমরা কুরআনের সেসব বক্তব্য পরীক্ষা করব যা আজকের দিনে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যের রেকর্ড বলে মনে হয়। আগেকার যুগের লোকেরা এগুলোর আপাত অর্থ অনুধাবন করতে পারতো। এটা কল্পনা করা কিভাবে সম্ভব যে, কুরআনে পরবর্তী কালে যদি কোন পরিবর্তন হত, তাহলে সমগ্র কুরআনব্যাপী ছড়িয়ে থাকা দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদগুলো কিভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে পারল?[৩] মূল পাঠের সামান্যতম পরির্বতনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই অসামান্য সঙ্গতি ধ্বংস করে দিত যা কুরআনের বৈশিষ্ট্য। এটা (অর্থাৎ কুরআনে বিকৃতি ঘটানো) আধুনিক জ্ঞানের সাথে সেসব বর্ণনার সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে আমাদেরকে বাধা দিত। কুরআনব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এসব বর্ণনা নিরপেক্ষ গবেষকের কাছে বিশুদ্ধতার সুস্পষ্ট ছাপের মত দেখায়।

কুরআন হল এক প্রচার যা মানুষকে জানানো হয়েছিল ঐশী বাণী বা ওহীর প্রক্রিয়ায়। এই অবতীর্ণ হবার ধারা মোটামুটি তেইশ বছর ধরে চলেছিল। এটা হিজরাতের আগে ও পরে সমান সময়কাল-ব্যাপী ঘটেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তামাম গ্রন্থব্যাপী (কুরআন ব্যাপী) বৈজ্ঞানিক বিষয় ছড়িয়ে থাকাটা ভেবে দেখবার জন্য স্বাভাবিক ছিল। গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা যেটি করেছি, সূরাগুলি একত্র করার পরে আমরা সেগুলিকে একের পর এক পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করেছি। সূরাগুলি কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত? বিশেষ

---

৩. কুরআনের যেসব বর্ণনা আজকের দিনে আমরা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি, সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের লোকেরা সঙ্গত কারণেই সেগুলি বুঝতে পারেনি। তারা নিজেদের মত করে এসব আয়াত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থে এধরণের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কুরআনের মূল পাঠে তারা কোন রকম হস্তক্ষেপ করেনি। সেটা যদি তারা করত, তাহলে সেসময়ের দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে নিজেদের বুঝ অনুসারে পরিবর্তন করে ফেলত যেমনটি করা হয়েছে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে। এর ফলে আমরা কুরআনে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য দেখতে পেতাম। আল্লাহর শোকর, কুরআনে তেমন একটি তথ্যও নেই। আল কুরআন যে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর ধরে অবিকৃত আছে, তা মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। —অনুবাদক।

শ্রেণী- বিন্যাসকরণের কোন নির্দেশনা আমি কুরআনে পাইনি। তাই আমি সেগুলিকে আমার ব্যক্তিগত ধারায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রথমে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত তা হল সৃষ্টিপর্ব। এখন, যেসব আয়াতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, তার সাথে মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কিত আজকের প্রচলিত ধারণার তুলনা করা সম্ভব। তারপর আমি আয়াতগুলিকে নিম্নলিখিত সাধারণ শিরোনামে বিভক্ত করেছিঃ জ্যোতির্বিদ্যা, পৃথিবী, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত, মানুষ এবং বিশেষকরে মানব প্রজনন; শেষেরটি হল এমন এক বিষয় যা কুরআনে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এসব সাধারণ শিরোনামের সাথে উপ-শিরোনাম যোগ করা সম্ভব। তাছাড়া, অধুনিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করাকে আমি সহায়ক মনে করেছি। এটি করা হয়েছে সৃষ্টিপর্ব, মহাপ্লাবন ও ইহুদীদের মিশর ত্যাগের মত বিষয়ের ক্ষেত্রে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি: আসুন প্রথমে কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টিপর্বকে পরীক্ষা করা যাক। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ধারণা বেরিয়ে আসে, তা হল বাইবেলের বর্ণনার সাথে এর পার্থক্য। এই ধারণা সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত যা পশ্চিমা লেখকরা প্রায়ই ভুল করে টেনে থাকেন। তারা এটি করেন গ্রন্থ দুটির মধ্যকার শুধুমাত্র সাদৃশ্য প্রকটিত করার জন্য। অন্যান্য বিষয়ের মত সৃষ্টিপর্বের কথা বলতে গেলে, পশ্চিমে একটা জোরালো প্রবণতা আছে এই দাবী করার যে, মুহাম্মাদ (সা) বাইবেলের দেহ-রেখা নকল করেছেন। বস্তত: বাইবেলের বর্ণনা মতে ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয় আর বাড়তি এক দিন খোদার বিশ্রামের দিন তথা সাবাত। বিষয়টিকে সূরা আল আরাফের এই অয়াতের (৭:৫৪) সাথে তুলনা করা সম্ভব।

'আপনার প্রভু আল্লাহ যিনি আসমান ও যমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

আমাদেরকে সোজা কথায় উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, আধুনিক ব্যাখ্যাকারীগণ 'আইয়াম' শব্দটির ব্যাখ্যার উপর জোর দিচ্ছেন। শব্দটির একটি অনুবাদ হল 'দিবসসমূহ' যার অর্থ চব্বিশ ঘন্টা সময়কাল নয়, বরং দীর্ঘ সময়কাল বা বহু যুগ।

আমার কাছে যেটা মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী মনে হয়েছে তা হল, বাইবেলের বর্ণনার বিপরীতে কুরআন আসমান-যমিন সৃষ্টির কোন ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে না। যখন এই গ্রন্থে সাধারণভাবে সৃষ্টির কথা বলা হয়, তখন আসমানকে যমিনের আগে আবার যমিনকে আসমানের আগে উল্লেখ করা হয়। যেমন, সূরা ত্ব-হা এর এই আয়াতটি (২০:৪)

'(খোদা) যিনি সৃষ্টি করেছেন যমিন আর উচ্চ আসমানসমূহ।'

আসলে, কুরআন থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর ক্রমবিকাশের অনুষঙ্গ। এই গ্রন্থে প্রারম্ভিক গ্যাসীয় অবস্থার (দুখান) অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ মৌলিক তথ্যাবলী আছে আর তা (অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থা) ছিল অখণ্ড। এর উপাদানগুলি যদিও প্রথমে একত্র মিলিত (রাতাক) ছিল, পরবর্তীতে সেগুলি পৃথক হয়ে যায় (ফাতাক)। এই ধারণাটি সূরা ফুসসিলাত (৪১:১১) এ উল্লেখিত হয়েছে।

'আল্লাহ আসমানের দিকে লক্ষ্য করলেন যখন এটা ছিল ধোঁয়া।'

একই কথা সুরা আল আম্বিয়াতে বলা হয়েছে (২১:৩০) 'অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আসমান ও যমিন একত্রে মিলিত অবস্থায় ছিল? পরে আমি তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছি।'

পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে অসংখ্য জগত গঠিত হয়। এটি এমন এক ধারণা, যা কুরআনে কয়েক ডজনবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙ্গটি একবার সূরা আল ফাতিহার (১:১) প্রথম আয়াতেও এসেছে।

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রভূ।'

এসব কিছুই আধুনিক ধারণার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ধারণাটি হল, প্রাথমিক নীহারিকার অস্তিত্ব এবং তার উপাদানগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এসব উপাদান প্রাথমিক একক জড়পিণ্ড গঠন করেছিল। এই বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ছায়াপথ গঠিত হয়েছিল। তারপর এগুলো যখন বিভক্ত হয়েছিল, তখন নক্ষত্র গঠিত হয়েছিল আর তা থেকে জন্ম নিয়েছিল গ্রহ।[৪]

---

৪. একক জড়পিণ্ড থেকে বিশ্বসৃষ্টি : বিশ শতকের আগে বিষয়টি বিজ্ঞানের জগতে অজানা ছিল। অথচ, কুরআনে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন ১৯৬৪ সালে। সর্ব প্রথম বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জর্জ ল্যামেটর জানান, আদি এবং

আসমান আর যমিনের মধ্যবর্তী সৃষ্টির উল্লেখও কুরআনে আছে। যেমন সূরা আল ফুরকানে (২৫:৫৯) বর্ণনা করা হয়েছে-

'আল্লাহ একক, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান, যমিন আর তাদের মাঝে যা কিছু আছে।'

মনে হচ্ছে, এই মধ্যবর্তী সৃষ্টি হল আধুনিক আবিষ্কারের পদার্থ-সেতু (interstellar matter) যা সুশৃংখল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বাইরে বর্তমান আছে।[৫] এই জরিপ আমাদেরকে নিশ্চিতরূপে দেখায় কিভাবে কুরআনের তথ্য ও বক্তব্য বিপুল সংখ্যক আধুনিক বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করে। আমরা বাইবেলের পাঠ থেকে— সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়গুলোর বর্ণনা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এসব বর্ণনা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য: বিশেষ করে সেই পর্যায় যেখানে পৃথিবীর সৃষ্টি (৩য় দিন) স্থান পেয়েছে আসমান সৃষ্টির আগে (৪র্থ দিন); এটি সবারই জানা আছে যে, আমাদের গ্রহ এসেছে তার আপন নক্ষত্র সূর্য থেকে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, আমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারি যে, বাইবেল থেকে প্রেরণা লাভকারী একজন লোক কুরআনের রচয়িতা হতে পারেন, আর লোকটি তাঁর নিজের ইচ্ছায়, বাইবেলের বর্ণনাকে সংশোধন করেছিলেন মহাবিশ্ব গঠন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণায় উপনীত হবার জন্য, অথচ এই ধারণা গঠিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর শত শত বছর পরে?

একক জড়পিণ্ড এক মহাবিস্ফোরণের (big bang) ফলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯৩৩ সালে। তারপর বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো ১৯৪০ সালে গাণিতিকভাবে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব প্রমাণ করেন। ১৯৬৪ সালে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন Background Radiation 2.73k আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞানীদের অনেক গবেষণা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে যা জানা গেছে তা হল, সমগ্র মহাবিশ্ব একক জড়পিণ্ড ছিল। অকল্পনীয় এক মহাশক্তি এই জড়পিণ্ডের মহাসংকোচন ঘটায়। বর্তমানের সুবিশাল মহাবিশ্বের আকার হয়ে পড়ে ১০.৩৩ সে.মি.। অর্থাৎ ১ এর পিঠে ৩৩টি শূন্য বসালে যে সুবিশাল সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা দিয়ে ১ সেন্টিমিটারকে ভাগ করলে যে অকল্পনীয় ক্ষুদ্র আকার পাওয়া যায় তার সমান। তারপর শূন্য সময়ে (plank time) ঘটে সেই মহা বিস্ফোরণ। একক জড় পিণ্ডটি বহুধাবিভক্ত হয়। এভাবেই সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। —অনুবাদক।

৫. আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তুঃ আকাশ ও পৃথিবীর যেসব স্থান আমরা শূণ্য দেখতে পাই, সেসব আসলে শূণ্য নয়। দৃশ্য-অদৃশ্য নানা রকম জিনিসে এসব শূণ্য স্থান পূর্ণ রয়েছে। এসব হল, ধূলিকণা, গ্যাস, এ্যাটমিক বস্তুকণা, চুম্বকক্ষেত্র, বিকিরণ বলয়, শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি। এই একবিংশ শতাব্দীতে কয়জন এসব তথ্য জানে? অথচ প্রাচীন গ্রন্থ আল কুরআনে তার উল্লেখ আছে।— অনুবাদক।

জ্যোতির্বিদ্যা, আলোক এবং গতি

আসুন আমরা জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি মনোনিবেশ করি। যখনই আমি পশ্চিমাদের কাছে কুরআনের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বর্ণনা তুলে ধরি, তখন তাদের স্বাভাবিক উত্তর হয়ে থাকে- এতে কোন বিশেষত্ব নেই। তারা মনে করেন, ইউরোপের অনেক আগেই আরবরা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিল । এটা আসলে ইতিহাসের জ্ঞান না থাকার ফলে সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা । প্রথমত: আরব দেশগুলো বিজ্ঞানে উন্নত হয় কুরআন অবতীর্ণ হবার উল্লেখযোগ্য সময় পরে। দ্বিতীয়ত: ইসলামী সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের যে জ্ঞান প্রচলিত ছিল, তার সাহায্যে কুরআনের মহাকাশ সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে তুলনীয় বক্তব্য লেখা একজন মানুষের জন্য সম্ভব ছিল না ।

এখানে আবারো উল্লেখ করতে হচ্ছে, বিষয়টি এত ব্যাপক যে, আমি শুধু এটির দেহ-রেখা সরবরাহ করতে পারি। বাইবেলে যেখানে সূর্য এবং চাঁদকে ভিন্ন আকারের দুটো আলোকিত বস্তু বলা হয়েছে, কুরআন সেখানে তাদের পার্থক্য করেছে দুটো ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে : চাঁদের জন্য আলোক (নূর), সূর্যের জন্য প্রদীপ (সিরাজ)। প্রথমটি জড়-বস্তু যা আলোক প্রতিফলিত করে, দ্বিতীয়টি হল মহাজাগতিক কাঠামো যা জ্বলতেই আছে আর আলো এবং তাপের উৎস নক্ষত্র (নাজম) শব্দটির সাথে আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী সর্বনাম আছে যা নির্দেশ করে যে, এটি জ্বলতে থাকে আর নিজেকে ক্ষয় করে চলে যখন এটি রাতের আঁধার ভেদ করে চলে : শব্দটি হল 'সাকিব' ।

কুরআনে 'কাওকাব' নিশ্চিতভাবেই গ্রহকে বুঝায়। এরা সূর্যের মত আলো তৈরি করে না বরং প্রতিফলিত করে । আজকে এটি জানা কথা যে, প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্রেরই আপন গতিবেগ আছে। তারকারাজির অবস্থানের দ্বারা এবং মহাকর্ষ বলের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা কিভাবে কক্ষপথে তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত তা-ও জানা কথা। এই ভারসাম্য তাদের ভর-বেগের সাথে সম্পর্কযুক্ত । কিন্তু এটাই কি কুরআন বর্ণনা করছে না যা আমাদের কালে এসে বুঝতে পারা গিয়েছে? কুরআনে এই ভারসাম্যের ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল আম্বিয়ায় (২১:৩৩)

'আল্লাহ হলেন তিনি, যিনি রাত সৃষ্টি করেছেন, দিন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চাঁদ। প্রত্যেকেই এক এক কক্ষে গতিশীল আছে।'[৬]

যে আরবী শব্দ এই গতি প্রকাশ করছে তা হল একটি ক্রিয়া 'সাবাহা' (মূল পাঠে 'ইয়াসবাহুন'); এটি এমন এক গতির ধারণা দেয় যা কোন চলমান বস্তু থেকে আসে। এটা হতে পারে একজন মাটির উপর দিয়ে দৌড়ালে তার পায়ের গতি, কিংবা পানিতে সাঁতার কাটার ক্রিয়া। শূন্যমার্গের বস্তুর ক্ষেত্রে একজন শব্দটিকে তার প্রকৃত অর্থে অনুবাদ করতে বাধ্য। অর্থাৎ আপন গতিতে ভ্রমন করা। দিন ও রাতের ধারাবাহিকতার বর্ণনা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার হত যদি না বাস্তবতা এমন হত যে, কুরআনে এটি ব্যক্ত করা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষায়। এটা এই কারণে যে, কুরআনের সূরা আয্ যুমার (৩৯:৫) এ 'কাওয়ারা' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়াপদটি বর্ণনা করেছে যে, রাত নিজেকে দিনের চারপাশে জড়ায় বা কুন্ডলি পাকায়। 'কাওয়ারা' ক্রিয়াটির প্রকৃত অর্থ হল, একটা পাগড়ি মাথার চারপাশে জড়ানো। একেবারেই যুক্তিসঙ্গত তুলনা; তবুও যে সময় কুরআন অবতীর্ণ হয়, সে সময় এই তুলনা করবার জন্য প্রয়াজনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য অজানা ছিল।[৭] মহাশূন্যের বিকাশ এবং সূর্যের জন্য নির্ধারিত স্থান—এগুলিও বর্ণিত হয়েছে। এগুলিও অতি বিস্তারিত আধুনিক ধারণার সাথে

---

৬. সূর্যের কক্ষপথঃ সূর্যের অবস্থান ও গতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল প্রায় দুই সহস্রাব্দ ব্যাপী। ২য় শতাব্দীতে টলেমি যে সৌর জগতের ধারণা পেশ করেন, তাতে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে; সূর্যসহ গ্রহ-উপগ্রহগুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন নিকোলাস কোপার্নিকাস। ১৫১২ সালে তিনি সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনিও বড় এক ভুল করে বসেন। তিনি জানান, সূর্য স্থির আর গ্রহ-উপগ্রহগুলি তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই ভ্রান্তি টিকে ছিল চারশ বছরেরও বেশি। তারপর ১৯২৭ সালে অধ্যাপক শেপলি সূর্যের কক্ষপথ আবিস্কার করেন। তিনি হিসাব করে দেখান, সূর্য (তার গ্রহ-উপগ্রহের পরিবার নিয়ে) প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। যে গন্তব্যের দিকে সূর্য বিপুল গতিতে এগিয়ে চলেছে, তিনি তার নাম দিয়েছেন 'সোলার এপেক্স'। বিজ্ঞানীদের প্রায় দুই হাজার বছরের বিভ্রান্তির বিপরীতে আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে জানিয়ে দিয়েছেনঃ "সূর্য তার নিজের মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এটি মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার স্থাপিত হিসাব।"

৭. পৃথিবীর আকার ঃ এ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ছিল এই যে, পৃথিবী সমতল। এই ধারণা মধ্যযুগ পর্যন্ত টিকে ছিল। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক সর্ব প্রথম ১৫৯৭ সালে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার। অথচ তারও এক হাজার বছর আগে কুরআনে বিষয়টির উল্লেখ আছে। রাত-দিনের আবর্তন বুঝাতে 'কাওয়ারা' বা কুন্ডলী পাকানো শব্দটি ব্যবহার করে এ-কথাই বুঝানো হয়েছে। পৃথিবী গোলাকার হলেই কেবল রাত-দিন একে অন্যের উপর কুন্ডলী পাকাতে পারে। -অনুবাদক।

সংগতিপূর্ণ। কুরআন মহাবিশ্বের প্রসারণের কথাও উল্লেখ করেছে।[৮] মহাশূন্য বিজয়ের কথাও আছে এই গ্রন্থে। উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে মানুষ চাঁদেও ভ্রমন করেছে । কিন্তু আমরা যখন সূরা আর রাহমান (৫৫:৩৩) পাঠ করি তখন নিশ্চিতভাবেই এটি আমাদের মনে আসে।

'হে জ্বীন ও মানুষ! যদি অসমান ও যমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে পারো তবে প্রবেশ করো! তোমরা তা পারবে না প্রবল শক্তি ছাড়া।'[৯]

এই শক্তি আসে সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে, আর সমগ্র সূরাটির বিষয়বস্তু হল মানুষকে আল্লাহর দয়ার স্বীকৃতি দিতে আহ্বান করা।

পৃথিবী

আসুন আমরা এখন পৃথিবীতে ফিরে আসি । আসুন আমরা উদাহরণ হিসেবে আল কুরআনের (৩৯:২১) এই আয়াতটি পরীক্ষা করি ।

---

৮. মহাবিশ্বের প্রসারণ ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রীম্যান এবং বেলজিয়ামের সৃষ্টিতত্ত্ববিদ জর্জ লেমেট হিসাব করে দেখেন, এই বিশ্বের প্রসারণ ঘটে চলেছে। ছায়াপথগুলি একটি থেকে আরেকটি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল কর্তৃক ১৯২৯ সালে টেলিস্কোপ আবিষ্কারের ফলে। হাবলেরও এক হাজার তিনশ বছর আগে কুরআনে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রাচীন কালে একজন নিরক্ষর মরুচারীকে এই তথ্য কে জানিয়েছিল যা জানতে হাবল টেলিস্কোপের মত অত্যাধুনিক যন্ত্রের প্রয়োজন? এর একটিই উত্তর হতে পারে ঃ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্।— অনুবাদক।
মহাসংকোচন ঃ বিশ্ব জগতের এই প্রসারণ অনন্তকাল চলবে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক সময় প্রসারণ বল খুব দুর্বল হয়ে পড়বে। নানা কারণে মহাকর্ষবল বৃদ্ধি পাবে। তখন শুরু হবে মহাসংকোচন। এক সময় পরস্পরের প্রবল আকর্ষণে এই জগত একটি অতিক্ষুদ্র, অতি উত্তপ্ত, অতি ঘন বস্তুকণায় পরিণত হবে। তারপর হবে আরেক মহাবিস্ফোরণ। এভাবে নতুন করে সৃষ্টির সূত্রপাত হবে। এসব এমন বিষয় যা এই একবিংশ শতকেও অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক জানেন না। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ আলকুরআনে এগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ 'সে-দিন আমি মহাকাশ গুটিয়ে নেব যেমন করে গুটিয়ে নেওয়া হয় লিখিত দপ্তর। আর প্রথমবার সৃষ্টির সময় যেভাবে শুরু করেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি করা হবে।' সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪। —অনুবাদক।

৯. মহাশূণ্য বিজয় ঃ সেই সুদূর অতীতে যখন স্থলপথে উট আর ঘোড়া এবং জলপথে পালের নৌকা বা জাহাজ ছাড়া আর কোন যানবাহনের কথা আরবের মরুচারীরা জানতো না, তখন তাদেরকে জানানো হয়েছে মহাশূণ্য ভ্রমণের কথা! আলোচ্য আয়াতটিতে একটি শর্তমূলক বাক্যাংশ রয়েছে। যদি বা if এর আরবি প্রতিশব্দ হিসাবে 'লাও' ব্যবহার করলে বুঝতে হয়, শর্তটি পূরণ হবার নয়। কিন্তু 'ইন' ব্যবহার করা হলে বুঝতে হবে শর্তটি পূরণ করা সম্ভব। সূরা আর রাহমানের আলোচ্য আয়াতটিতে শর্ত প্রকাশের জন্য আরবিতে 'ইন' ব্যবহার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে (অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে পারলে) মহাশূণ্য বিজয় সম্ভব। —অনুবাদক।

'তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এবং নানাভাবে যমিনে প্রবেশ করান? তারপর তিনি মাঠে নানা রঙের ফসল ফলান।'

এরকম ধারণা আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, দীর্ঘকাল আগে এগুলি প্রচলিত ছিল না। আমরা পানিচক্রের প্রথম সুসঙ্গত বর্ণনা ষোড়শ শতকের বার্ণার্ড প্যালিসীর আগে লাভ করিনি। এর পূর্বে লোকরা এমন তত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলতো যার মর্ম হল, বায়ু প্রবাহের ফলে সমুদ্রের পানি মহাদেশের ভেতরের দিকে প্রবেশ করে; পরে সেই পানি সমুদ্রে ফিরে যায় মহাগহ্বর দিয়ে, যাকে প্লেটোর সময়কাল পর্যন্ত বলা হতো টারটারাস। সতের শতকে ডেকার্টের মত মহান চিন্তাবিদও এটা বিশ্বাস করতেন। আর এমন কি ঊনিশ শতকে অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত ছিল। সেই মতবাদে বলা হয় যে , পর্বতের শীতল গহ্বরে পানি জমে যায় আর ভূ-গর্ভস্থ হ্রদ গঠন করে। সেই হ্রদ থেকে ঝর্ণারা পানি পায়। আজ আমরা জানি যে, বৃষ্টির পানির পরিস্রাবনের কারণে এমনটি হয়। যদি কেউ আধুনিক পানি বিজ্ঞানের তথ্যের সাথে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এই বিষয়ের উপর প্রাপ্ত বর্ণনার তুলনা করে, তাহলে সে এই দুটির মধ্যকার উল্লেখযোগ্য সামঞ্জস্য লক্ষ্য না করে পারবে না। ভূ-তত্ত্বের উপর ইদানিং কালের অর্জিত জ্ঞানভিত্তিক তথ্য হল, ভাঁজ এর পরিস্থিতি যা পর্বতশ্রেণী গঠন করেছিল। একই কথা পৃথিবীর ভূ-ত্বকের ক্ষেত্রেও সত্য যেটা কঠিন খোলসের মত। এটির উপর আমরা বাস করতে পারি। অথচ গভীরের স্তরগুলো উষ্ণ এবং তরল, আর তাই প্রাণের যে কোন কাঠামোর জন্য অনুপযুক্ত। এটাও জানা কথা যে, পাহাড়-পর্বতের অটলতা ভাঁজের পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। কারণ ভাঁজগুলোই বন্ধুরতার ভিত্তি সরবরাহ করেছিল যা পাহাড়-পর্বত গঠন করেছিল। আসুন কুরআনে এই বিষয়ের অনেক বর্ণনার মধ্য থেকে একটির সাথে আধুনিক জ্ঞানের তুলনা করি। এটি নেওয়া হয়েছে সূরা আন নাবা (৭৮:৬-৭) থেকে।

'আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃত আর পাহাড়-পর্বতকে গোঁজের মত করি নি?'

গোঁজ / পেরেক (আওতাদ) হল ভূ-তাত্ত্বিক ভাঁজের গভীর ভিত আর এগুলো মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট তাঁবুর খুটার মত। অন্যান্য বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী আধুনিক জ্ঞানের সাথে কোন বিরোধের উপস্থিতি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন।[১০]

কিন্তু অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি হল, কুরআনে জীবন্ত জিনিস সম্পর্কিত বক্তব্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়জগত সম্পর্কেই, বিশেষ করে প্রজনন সম্পর্কে। প্রথমে এসব পড়ে আমি হতবাক হয়েছিলাম। আমাকে আরেকবার এই বিষয়ে জোর দিতে হচ্ছে যে, কেবলম আধুনিক যুগে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এরকম অনেক আয়াতের বিষয়বস্তুকে আমাদের কাছে অধিকতর বোধগম্য করেছে। আরো কিছু আয়াত আছে যা আরো বেশি সহজবোধ্য কিন্তু যা গোপন করে এমন জীব-বৈজ্ঞানিক অর্থ যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা সূরা আল আম্বিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে যার অংশ বিশেষ আগেই উদ্বৃত করা হয়েছে।

‘অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আসমান ও যমিন মিলিত অবস্থায় ছিল, তারপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি আর পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি; তারা কি বিশ্বাস করবে না ?’ (২১:৩০)

এটি আধুনিক ধারণাকে নিশ্চিত করে যে , প্রাণের উৎস জলীয়।

মুহাম্মাদের (সা) সময় কালে কোন দেশেই উদ্ভিদ বিদ্যা এতটা উন্নত হয়নি যে, সাধারণভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে যে উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ আছে। তথাপি আমরা সূরা ত্বাহা (২০:৫৩)-এর নিম্নলিখিত বাণী পড়তে পারি ঃ

‘(আল্লাহ তিনিই যিনি) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন আর তার দ্বারা

---

১০. পর্বতের ভূমিকা ঃ পাহাড়-পর্বতের যে অংশ পৃথিবীর উপরে রয়েছে তা-ই সব নয়। তার চেয়ে অনেক বড় অংশ থাকে ভূ-ত্বকের নিচে। ঠিক যেন গোঁজ বা পেরেক যার কিছু অংশ থাকে বাইরে আর কিছু ভেতরে। উদাহরণ স্বরূপ হিমালয় পর্বতের কথা বলা যেতে পারে। এই বিশাল পর্বতমালার উপরের অংশ মাত্র পৌনে নয় কিঃমিঃ। অথচ এর গভীরে প্রোথিত অংশ প্রায় ৮০ কিঃমি। এই যে পৃথিবীর পিঠে পর্বতের গোঁজ— তার কথা বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অতি নগন্য সংখ্যক লোক জানে। অথচ কুরআনের মত প্রাচীন গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য এটি কি যথেষ্ট নয়? —অনুবাদক।

জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ গজান যার একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন।'[১১]

আজকে আমরা জানি যে, ফল আসে সেই সব উদ্ভিদ থেকে যাদের প্রজনন বৈশিষ্ট আছে (এমন-কি যখন এটা অনিষিক্ত ফুল থেকে আসে , যেমন- কলা)। সূরা আর-রাদ এ (১৩:৩) আমরা পাঠ করিঃ

'সকল ফলের মধ্যে (তিনি) হাজির করেন (পৃথিবীর উপর) দুইয়ের জোড়া।'

প্রাণিরাজ্যে প্রজনন মানব প্রজননের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখন আমরা সেগুলি পরীক্ষা করব। শরীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে, একটা আয়াত আছে, যা আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে : রক্ত সঞ্চালন আবিস্কারের এক হাজার বছর আগে, আর অন্ত্রের মধ্যে কি ঘটে তা জানবার মোটামুটি তেরশ বছর আগে এই নিশ্চয়তা দেওয়া যে, অঙ্গগুলো পুষ্ট হয় পরিপাকজনিত শোষণের প্রক্রিয়ায়। কুরআনের একটি আয়াত দুধের উপাদানের উৎস বর্ণনা করে, তা এসব ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । এই আয়াত বুঝার জন্য, আমাদেরকে জানতে হবে যে, অন্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। আরো জানতে হবে যে, সেখান থেকে খাদ্যের নিষ্কাশিত উপাদান রক্তস্রোতে মিশে যায় একটা জটিল পন্থার মাধ্যমে। কখনো-বা এটি ঘটে যকৃতের পথে; এটি নির্ভর করে খাদ্য উপাদানের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর। রক্ত তাদেরকে বয়ে নিয়ে যায় দেহের সকল অঙ্গে, যার মধ্যে আছে দুধ উৎপাদনকারী দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে, আসুন আমরা কেবল বলি যে, মূলতঃ অন্ত্রের মধ্যকার বস্তু থেকে কিছু উপাদান অন্ত্রের প্রাচীরস্থ নালিকায় পৌঁছায়, আর সে উপাদানগুলো রক্তস্রোতের দ্বারা বাহিত হয়। এই ধারণার গুরুত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করা যাবে, যদি আমরা আল কুরআনের (আন নাহল এর ১৬:৬৬) এই আয়াত বুঝতে পারি- 'নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে । আমরা তোমাকে পান করতে দিই যা তাদের দেহের মধ্যে রয়েছে, যা আসে অন্ত্রের মধ্যকার বস্তু ও রক্ত থেকে, দুগ্ধ, যা নিশ্চয় তৃপ্তিদায়ক তাদের জন্য যারা এটা পান করে।'

---

১১. আরেকটি আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ 'পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা যমিনের উদ্ভিদ হোক অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি হোক কিংবা সেই সব জিনিস যা তারা জানেও না।' উদ্ভিদের যে লিঙ্গভেদ আছে তা আধুনিক যুগের আবিষ্কার। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন গ্রন্থ আল কুরআনে তারও উল্লেখ আছে। —অনুবাদক।

মানুষসৃষ্টি

আল কুরআনে মানব- প্রজনন সম্পর্কে অনেক বক্তব্য আছে। এসব বক্তব্য সেই ভ্রূণতত্ত্ববিদকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, যিনি কুরআনকে মানব রচিত বলে ব্যাখ্যা করতে চান। মানুষ এ ধরনের বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে কেবল সেই মৌলিক বিজ্ঞানের জন্মের পরে যা আমাদের জীববিদ্যার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, আর বিশেষ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিস্কারের পরে। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন এমন কোন লোকের পক্ষে এই ধরণের ধারণা প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল । এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না যে, সেই সময় মধ্যপ্রাচ্য বা আরবে বসবাসকারী লোকেরা এই বিষয়ের উপর ইউরোপ বা অন্য যে কোন স্থানে বসবাসকারী লোকের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখত। আজকের দিনে অনেক মুসলিম আছেন যারা কুরআন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে ভাল জ্ঞান রাখেন । তারা পরিষ্কারভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রজনন সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত এবং মানুষের জ্ঞানের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে । আমি সব সময় মনে রাখব সৌদি আরবে লালিত আঠার বছর বয়সের এক তরুণ মুসলিমের মন্তব্য। এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে কুরআনে বর্ণিত প্রজনন সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লখ করেছিল। বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সে বলেছিল, 'কিন্তু এই গ্রন্থটি আমাদেরকে বিষয়টির উপর সকল জরুরি তথ্য সরবরাহ করে । আমি যখন বিদ্যালয়ে পড়তাম, শিক্ষকরা কুরআন ব্যবহার করতেন। আমাকে ব্যাখ্যা করতেন কিভাবে সন্তান জন্ম লাভ করে। যৌন শিক্ষার উপর আপনাদের বইগুলো কিছুটা দেরিতে দৃশ্যপটে এসেছে !'

এই বিষয়টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কুরআনের সময়কালে এই বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস ছিল কুসংস্কার আর অবাস্তব কথায় ভরা; কুরআন এবং আধুনিক তথ্য উপাত্তের মধ্যে সামঞ্জস্যের মাত্রা অনেক বেশি। আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি, সেই সময়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার কোন উল্লেখ কুরআনে নেই।

আসুন আমরা এখন এই সমস্ত আয়াত থেকে নিষিক্তকারী তরলের জটিলতা সম্পর্কে যথার্থ ধারণাগুলি বাছাই করি। এটি এক বাস্তবতা যে, অতি নগন্য

পরিমাপ প্রয়োজন নিষিক্তকরণের জন্য। এটার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সারাংশ— যদি আরবী শব্দ 'সুলালা'কে এভাবে অনুবাদ করতে পারি। নারীর প্রজনন অঙ্গে (জরায়ুতে) ডিম্বানুর আটকে যাওয়াকে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কয়েকটি আয়াতে 'আলাক্ব' শব্দটি দ্বারা। এই শব্দটি একটি সূরারও শিরোনাম। বলা হয়েছে :

'তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দৃঢ়ভাবে আটকানো বস্তু থেকে।'

আমি মনে করি না, 'আলাক' শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা ছাড়া তার অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত অনুবাদ হতে পারে। মায়ের জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের বিকাশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সে বর্ণনা নির্ভুল। কারণ, যে সরল শব্দগুলি ভ্রূণ বিকাশের পর্যায় উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এটার বিকাশের মৌলিক ধাপগুলি ঠিকঠিক ব্যক্ত করে । সূরা আল মুমিনুনের একটি আয়াত নিম্নরূপ (২৩:১৪):

'আমি দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা বস্তুটাকে চর্বিত গোস্তপিণ্ডের রূপ দিই , পরে তাকে পরিণত করি হাড়-হাড্ডিতে, তারপর তার উপরে দিই আবরণ মাংশপেশীর দ্বারা।'

চর্বিত গোস্তপিণ্ড পরিভাষাটি (মুদগা) যথার্থভাবে বুঝায় ভ্রূণ বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়কে। এটি জানা কথা যে , এই পিন্ডের মধ্যে অস্থি গঠিত হয় আর তারপর এগুলো পেশী দ্বারা আবৃত হয়। অক্ষত পেশী (লাহম) পরিভাষার এটিই অর্থ। ভ্রূণ একটি পর্যায় অতিক্রম করে সেখানে কিছু অঙ্গ যথাযথ এবং কিছু অঙ্গ যথাযথ নয়; এসব অঙ্গ-উপাঙ্গই পরে ব্যক্তি গঠন করবে। সম্ভবত: সূরা আল হাজ্জ (২২:৫) এর এই আয়াতের অর্থ এমনটিই:

'আমি মানুষকে লটকে থাকা বস্তু থেকে এমন কিছু বানিয়েছি যার কিছু সুগঠিত কিছু অগঠিত ।'

পরে সূরা আস্ সাজদায় (৩২:৯) ইন্দ্রিয় আর দেহের মধ্যকার অঙ্গসমূহ গঠনের উল্লেখ আছে ।

'(আল্লাহ) তোমাকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং . . .'

এখানকার কিছুই আজকের তথ্য-উৎপাত্তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাছাড়া, সমসাময়িক কালের কোন ভ্রান্ত ধারণা কুরআনে প্রবেশ করেনি।

কুরআন ও বাইবেল

আমরা এখন শেষ বিষয়ে উপনীত হয়েছি। এটি হল, কুরআনের যেসব অনুচ্ছেদ বাইবেলেও উল্লেখ আছে, সেগুলিকে আধুনিক জ্ঞানের মুখোমুখি করা। আমরা ইতোমধ্যে একবার সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। ইতোপূর্বে আমি জোর দিয়েছি আধুনিক জ্ঞান ও কুরআনের মধ্যকার পূর্ণ সামঞ্জস্যের উপরে, আর উল্লেখ করেছি যে, বাইবেলে এমন বর্ণনা আছে যা বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই ; আমরা জানি যে, বাইবেলে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিরাট বর্ণনা হল ৬ষ্ঠ খৃস্ট পূর্বাব্দের ধর্মবেত্তাদের কাজ। এখানে পরিভাষাটি হল যাজকীয় (স্যাকেরডোটাল) বিবরণ। সম্ভবতঃ এটি একটি ধর্মোপদেশের মূল কথা যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল সাবাত পালনে লোকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। বিবরণটি গঠিত হয়েছিল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে এবং ফাদার ডি ভক্স (জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলের সাবেক প্রধান) যেমনটি উল্লেখ করেছেন, এই লক্ষ্য ছিল মূলতঃ চরিত্রগতভাবে বিধানমূলক।

বাইবেলে সৃষ্টির আরো একটি সংক্ষিপ্ততর এবং অধিকতর পুরাতন বিবরণ আছে। এটি হল তথাকথিত ইয়াহভিস্ট ভার্সন যা বিষয়টি বর্ণনা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে।

এগুলি উভয়ই জেনেসিস থেকে নেওয়া, তৌরাতের পেন্টাটিউকের প্রথম পুস্তকঃ মূসা (আ)-কে এটির লেখক মনে করা হয়। কিন্তু আজকে আমরা যে গ্রন্থ পাই তা, আমাদের জানা মতে, অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

জেনেসিসের স্যাকেরডোটাল বিবরণ খামখেয়ালিপূর্ণ বংশতালিকার জন্য খ্যাত যা আদম (আ) পর্যন্ত গিয়েছে। আর এটা কেউ গুরুত্বের সাথে নেন না। তথাপি, ম্যাথু এবং লুকের মত গসপেল লেখকরা তাদের লিখিত যীশুর বংশলতিকা তৈরিতে এটি কম-বেশি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। ম্যাথু পেছন দিকে (অর্থাৎ অতীতে) ইব্রাহিম (আ) পর্যন্ত গিয়েছেন আর লুক গিয়েছেন আদম (আ) পর্যন্ত। এই সমস্ত লেখা বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য,

কারণ পৃথিবীর বয়সের ব্যাপারে তারা এমন একটি সংখ্যা দেন এবং পৃথিবীতে মানুষের আগমণের এমন এক সময় উল্লেখ করেন, যা সুনিশ্চিতভাবেই আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিহীন। পক্ষান্তরে, কুরআন এই ধরণের তথ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইতোপূর্বে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, কত নিখুঁতভাবে কুরআন মহাবিশ্ব গঠনের আধুনিক ধারণার সাথে একমত হয়েছে। অথচ বাইবেলের বর্ণনা এগুলির সাথে বিরোধপূর্ণ; আদিম পানির রূপক সমর্থনযোগ্য নয় বললেই চলে। প্রথম দিনে নক্ষত্র সৃষ্টির আগে আলো সৃষ্টির বিষয়টিও সমর্থন করা যায় না; কারণ নক্ষত্র থেকে এই আলো উৎপন্ন হয়। তৃতীয় দিবসে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সূর্য সৃষ্টির আগেই; কারণ সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে। ষষ্ঠ দিবসে পৃথিবীর বুকে জীব-জন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল পঞ্চম দিবসে আকাশমার্গে পাখির আবির্ভাবের পরে; যদিও পাখপাখালিই পরে এসেছিল। এ সমস্ত বক্তব্য হল বাইবেল লিখিত হবার সময়ে প্রচলিত বিশ্বাসের ফল। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

বাইবেলের বংশলতিকা ইহুদী পঞ্জিকার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত। এটি দাবী করে যে, আজকের পৃথিবীর বয়স ৫৭৩৮ বছর; এগুলি মেনে নেওয়া খুব কঠিন। আমাদের সৌরজগত সম্ভবত ৪.৫ বিলিয়ন বছরের পুরাতন। পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব, যেভাবে আজকে আমরা তাকে চিনি, কম করে হলেও লক্ষ বছরের মত।

অতএব, এটি লক্ষ্য করা খুবই জরুরি যে, কুরআনে এধরণের দিন-ক্ষণের কোন উল্লেখ নেই আর এগুলি বাইবেলের পাঠে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

বাইবেল ও কুরআনের মধ্যে তুলনামূলক বিষয়ের দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ঃ এটি হল বন্যা প্রসঙ্গ। প্রকৃত প্রস্তাবে, বাইবেলের বর্ণনা হল দুইটি বর্ণনার মিশ্রণ যাতে ঘটনাগুলি ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলে বিশ্বব্যাপী বন্যার কথা বলা হয়েছে আর এটা ইব্রাহিম (আ)-এর সময়ের মোটামুটি ৩০০ বছর আগের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ইব্রাহিম (আ) সম্পর্কে যা জানি তদনুযায়ী, খৃস্টপূর্ব একুশ বা বাইশ শতকে এই বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ঘটেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে এটি সমর্থনযোগ্য নয়।

আমরা কিভাবে এই ধারণা গ্রহণ করতে পারি যে, খৃস্টপূর্ব একুশ বা বাইশ শতকে একটা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগে সকল সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়েছিল? অথচ আমরা জানি, এই সময়কাল ছিল, উদাহরণস্বরূপ, মিশরের মধ্য রাজ্যের (Middle Kingdom) আগেকার প্রথম অন্তর্বর্তী সময়।

পূর্ববর্তী কোন বিবরণই আধুনিক জ্ঞান অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাইবেল ও কুরআনের মধ্যকার বিরাট দূরত্ব পরিমাপ করতে পারি। বাইবেলের বিপরীতে , কুরআনের বর্ণনায় দুর্যোগ নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছিল, যেমন পেয়েছিল অন্যান্য খোদাদ্রোহী লোকেরা। কুরআনে এই দুর্যোগের কোন সময় উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনের বর্ণনার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক আপত্তি একেবারেই নেই।

তুলনামূলক আলোচনার তৃতীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল মূসা (আ)-এর কাহিনী । বিশেষ করে ফেরাউনের দাসে পরিণত হওয়া ইহুদীদের মিশর ত্যাগের ঘটনা আমার বইয়ে (The Bible the Quran and Science গ্রন্থে) এই বিষয়ের উপর যে গবেষণা উপস্থাপন করেছি, এখানে কেবল তা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যেসব পয়েন্টে বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনায় মিল এবং গরমিল আছে তা আমি উল্লেখ করেছি। কিছু কিছু বিবরণ আমি এমনও পেয়েছি, যেখানে গ্রন্থ দুটি খুবই কার্যকরভাবে একে অন্যের পরিপূরকের ভূমিকা পালন করেছে। ফেরাউনদের ইতিহাসে ইহুদীদের মিশর ত্যাগ (Exodus) যে স্থান দখল করে আছে, তা নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে। আমি এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, দ্বিতীয় র‍্যামেসিস এর পুত্র মারনেপ্‌তাহ্‌ exodus এর ফেরাউন হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। ধর্মগ্রন্থ দু'টির তথ্য পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের মুখোমুখি করলে সেগুলি এ কথাকে জোর সমর্থন করে। এটি বলতে পেরে আমি খুশি যে, বাইবেলের বিবরণ ফেরাউনদের ইতিহাসে মূসা (আ)-এর অবস্থান সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ পেশ করে ঃ মূসা (আ)-এর জন্ম হয় দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের রাজত্বকালে। অতএব, মূসা (আ)-এর কাহিনীতে বাইবেলের তথ্যের অনেক ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মারনেপ্তাহ্র মমির উপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করা হয়েছে। তাতে এই ফেরাউনের মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে আরো কার্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

বাস্তবতা হল, আজকে যে আমরা এই ফেরাউনের মমি পেয়েছি (ঠিক ঠিক বলতে গেলে, এটি আবিস্কৃত হয় ১৮৯৮ সালে), তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাইবেল লিপিবদ্ধ করেছে যে, দেহটা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীতে মৃতদেহের কি হয়েছিল তার কোন বিবরণ দেয় না। আল কুরআন সূরা ইউনূস-এ উল্লেখ করে, যে ফেরাউন অভিশপ্ত হয়েছিল তার দেহকে পানি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

'আজ আমি কেবল তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব যেন তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারো।' (১০ঃ৯২)

তাছাড়া, এই মমির উপর পরিচালিত একটি ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেহটা পানিতে দীর্ঘ সময় থাকতে পারেনি, কারণ দীর্ঘ সময় নিমজ্জিত থাকলে যে বিকৃতি ঘটে, তেমনটি এতে দেখা যায় না।

আবারো বলতে হয়, কুরআনের বর্ণনাকে আধুনিক জ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের মুখোমুখি করলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্যতম আপত্তিও আসতে পারে না।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম গঠিত হয়েছে মোটামুটিভাবে নয়টি শতাব্দী সময়কালে রচিত সাহিত্যকর্ম নিয়ে আর এতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাইবেলের প্রকৃত পাঠ রচনায় মানুষ যে ভূমিকা পালন করে, তা নেহায়েত কম নয়।

কুরআন অবতীর্ণ হবার একটি ইতিহাস আছে যা একেবারেই ভিন্ন। যে মুহূর্ত থেকে এটি মানুষের কাছে প্রথম প্রেরিত হওয়া শুরু হয়, তখনই তা মুখস্থ করে নেওয়া হয় এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবৎকালেই লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি ধন্যবাদার্হ যে, কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ■

আল কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব

ডঃ কীথ এল মূর

পি, এইচ, ডি; এফ, আই, এ, সি;

এ্যানাটমি বিভাগ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

মানব প্রজনন ও বিকাশ সম্পর্কিত বক্তব্য সমগ্র কুরআনে ছড়িয়ে আছে। মাত্র অতি সম্প্রতি এসব আয়াতের কতকগুলির বৈজ্ঞানিক অর্থ পুরাপুরি উপলব্ধি করা গেছে। এসব আয়াতের নির্ভুল ব্যাখ্যা পেতে এত দীর্ঘকাল দেরি হয়েছে মূলতঃ ভুল অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবের কারণে।

কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যার আগ্রহ নতুন নয়। লোকেরা মুহাম্মাদ (সা)-কে মানব প্রজনন সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অর্থ সম্পর্কে সব রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূল (সা)-এর উত্তর সমূহ হাদীস-সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে তোলে। কুরআনের আয়াত সমূহের যে অনুবাদ এই নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা সরবরাহ করেছেন সৌদি আরবের জিদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক শেখ আবদুল মজিদ জিনদানী।

"তিনি তোমাদের তৈরি করেছেন মাতৃগর্ভে কয়েক ধাপে, অন্ধকার তিনটি পর্দার আড়ালে।"

এই বক্তব্য একটি সূরা থেকে নেয়া হয়েছে।[১] আমরা জানি না কখন এটি উপলব্ধি করা হয় যে, মানুষ জরায়ুতে (গর্ভে) বিকশিত হয়; কিন্তু গর্ভে ভ্রূণের প্রথম জ্ঞাত চিত্র অঙ্কন করেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৫ শতকে। দ্বিতীয় খৃস্টাব্দে গ্যালেন গর্ভফুল ও ভ্রূণের পর্দার বর্ণনা দেন তাঁর 'ভ্রূণ গঠন' নামক গ্রন্থে। ফলে ৭ম শতাব্দীর চিকিৎসকগণ সম্ভবতঃ জানতেন যে, জরায়ুতে মানব-ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে। তবে ভ্রূণ বিকাশের ধাপগুলি সম্পর্কে তাদের জানার কোনই সম্ভাবনা নেই, এমনকি যদিও এরিস্টটল মুরগীছানার ভ্রূণ বিকাশের ধাপগুলি খৃঃপূঃ ৪ শতকে বর্ণনা করেন। মানব

---

১. সূরা ৩৯, আয়াত ৬

ভ্রূণ যে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়, এই উপলব্ধি ১৫ শতকের পূর্ব পর্যন্ত আলোচিত বা চিত্রিত হয়নি।
লিউয়েন হুক কর্তৃক ১৭ শতকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর মুরগী ছানার ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়গুলির বিবরণ তৈরি হয়। মানব ভ্রূণের ধাপগুলি বিংশ শতাব্দীর আগে বর্ণিত হয়নি। স্ট্রীটার (১৯৪১) পর্যায় করণের প্রথম পদ্ধতি উন্নয়ণ করেন, যে স্থান এখন দখল করেছে ও'রাহিলীর (১৯৭২) আরো নির্ভুল পদ্ধতি।

অন্ধকার তিন পর্দা ঃ

ক) তলপেটের সম্মুখ-প্রাচীর (anterior abdominal wall)
খ) জরায়ুর প্রচীর (uterine wall)
গ) ভ্রূণের পর্দা (amniochorionic membrane) ।
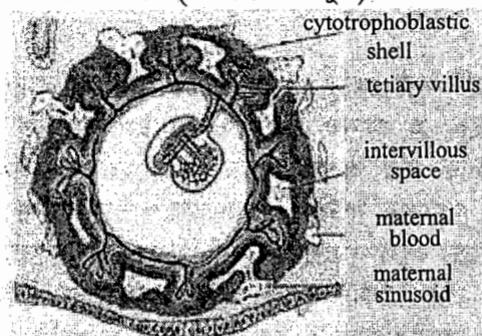
যদিও এই বক্তব্যের অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে, তথাপি এখানে যেটা উপস্থাপিত হয়েছে তা মনে হয় ভ্রূণতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।
"তারপর তাকে বিন্দু রূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি।"
এই বক্তব্য একটি সূরা থেকে গৃহীত।[২] ফোঁটা বা নুৎফার ব্যাখ্যা করা হয়েছে শুক্র দ্বারা। কিন্তু আরো অর্থবহ ব্যাখ্যা হতে পারে জাইগোট যা ব্লাস্টোসিস্ট গঠনের জন্য বিভক্ত হয় এবং জরায়ুতে প্রোথিত হয় ("অবস্থানস্থল")। এই ব্যাখ্যা কুরআনের অন্য একটি আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয় যা বিবৃত করে যে, "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মিশ্রিত বিন্দু থেকে"।[৩] জাইগোট গঠিত হয় শুক্র ও ডিম্বকের মিলনের ফলে ("মিশ্রিত বিন্দু")।
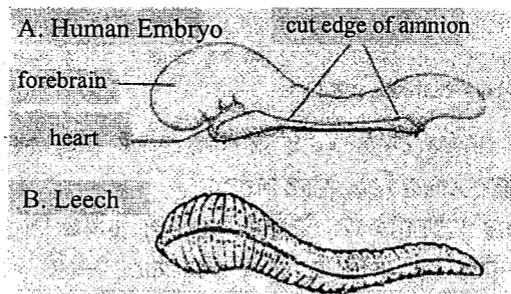
চিত্র-১ঃ সুরক্ষিত স্থান তথা জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত জাইগোট।

২. সূরা ২৩, আয়াত ১৩
৩. সূরা ৭৬, আয়াত ২

"তারপর আমি সেই বিন্দুকে পরিণত করি জোঁকের মত আঁকড়ে থাকা কাঠামোয়।"

এই বক্তব্য একটি সূরা থেকে নেয়া।[৪] 'আলাক্ব' শব্দটির অর্থ জোঁক বা রক্তচোষা। এটি ৭-২৪ দিন বয়সী মানব-ভ্রূণের যথাযথ বর্ণনা যখন এটি জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীর (এনডোমেট্রিয়াম) এর সাথে লেগে থাকে ঠিক তেমনিভাবে, যেমনভাবে জোঁক ত্বকের সাথে লেগে থাকে। যেভাবে জোঁক পোষক দেহ থেকে রক্ত নেয়, ঠিক সেভাবেই মানব-ভ্রূণ ডেসিডুয়া বা গর্ভবতীর জরায়ুর অন্তঃস্তর থেকে রক্ত নেয়। ২৩-২৪ দিনের একটি ভ্রূণ জোঁকের সাথে কত বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ তা লক্ষ্য করার মত বিষয়। যেহেতু ৭ম শতাব্দীতে কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা লেন্স পাওয়া যেত না, সেহেতু চিকিৎসকরা সম্ভবতঃ জানতেন না যে, মানব-ভ্রূণের এই জোঁকের মত চেহারা আছে। চতুর্থ সপ্তাহর প্রথম ভাগে ভ্রূণটি খোলা চোখে দেখার মত হয় কারণ এটি গমের দানার চেয়ে ছোট থাকে। এই পর্যায়ে মানব ভ্রূণের জোঁক সদৃশ আকৃতি লক্ষ্য করুন।

চিত্র-২ ঃ উপরে একটি ২৪ দিন বয়সী মানব ভ্রূণের চিত্র। নীচে, জোঁক বা রক্ত চোষকের চিত্র।

"তারপর সেই জোঁকের মত কাঠামোকে পরিণত করি চিবানো গোস্তের মত আকারে।"

এই বক্তব্যও সূরা ২৩ঃ১৪ থেকে। আরবী শব্দ 'মুদগাহ' অর্থ 'চর্বিত জিনিস বা চর্বিত পিন্ড'। চতুর্থ সপ্তাহর শেষের দিকে মানব ভ্রূণ দেখতে কিছুটা চর্বিত গোস্তপিন্ডের মত দেখায় (চিত্র-২)। চিবানোর মত আকৃতি ঘটে সোমাইটস থেকে যা দেখতে দাঁতের দাগের মত। সোমাইটসগুলো

৪. সূরা ২৩, আয়াত ১৪

কশেরুকার শুরু বা প্রাথমিক অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

চিত্র-৩ ঃ উপরে ২৮ দিন বয়সী মানব ভ্রূণের চিত্র যা তসবি দানার মত সোমাইটস দেখাচ্ছে। এটি নীচে দেখানো নমুনার দাঁতের দাগের অনুরূপ। মানব ভ্রূণের এই প্লাসটিসিন নমুনাটির আকৃতি চর্বিত গোস্তের মত।

"আরপর সেই 'চর্বিত গোস্ত' (এর আকার বিশিষ্ট বস্তু) থেকে তৈরি করি অস্থি, পরে অস্থিকে ঢেকে দিই গোস্ত দিয়ে।"

সূরা ২৩ঃ১৪ এর ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে যে, চর্বিত পিণ্ড পর্যায় থেকে হাড় ও পেশী গঠিত হয়। এটি ভ্রূণ-বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম অস্থি গঠিত হয় তরুণাস্থি নমুনা হিসাবে। আর তারপর মাংশপেশী গঠিত হয় তাদের চারদিকে দেহপ্রাচীর থেকে।

"তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে।"

সূরা ২৩ঃ১৪ এর এই শেষ অংশ ইঙ্গিত দেয় যে, অস্থির এবং পেশীর ফল হল অন্য প্রাণী। এই আয়াত বোধ হয় মানব-সদৃশ ভ্রূণের উল্লেখ করে যা গঠিত হয় অষ্টম সপ্তাহর শেষে। এই পর্যায়ে এটির স্বতন্ত্র মানব-বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সমস্ত আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক আকার ধারণ করে। অষ্টম সপ্তাহর পর, মানবভ্রূণকে বলা হয় অপরিণত শিশু (ফিটাস)। এটা সেই নতুন প্রাণী হতে পারে যাকে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

“আর তোমাদেরকে দান করেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।”
সূরা ৩২ঃ৯ এর এই অংশ নির্দেশ করে যে, শ্রবণ, দর্শন ও অনুভবের বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি এই পর্যায়ে গড়ে ওঠে, যা সত্য। অন্তঃকর্ণের প্রাথমিক রূপ উদ্ভব হয় চোখের আগে এবং মস্তিষ্ক (উপলব্ধির স্থান) শেষে পৃথক হয়।
“তারপর গোস্তপিণ্ড থেকে যা আংশিক গঠিত আর আংশিক অগঠিত থাকে”
সূরা ২২ঃ৫ এর এই অংশ মনে হয় নির্দেশ করে যে, ভ্রূণ গঠিত হয় পৃথককৃত ও অপৃথককৃত কলার (টিস্যু) সমণ্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তরুণাস্থি পৃথক হয়, তখন ভ্রূণের সংযোগ কলা বা তাদের চারদিকে কলান্তর (মেসেনকাইম) পৃথক থাকে না। পরবর্তীতে এটি পেশীতে ও হাড়ের সঙ্গে যুক্ত যোজক কলার দ্বারা পৃথক হয়।
“আর আমি গর্ভাধারে স্থিত রাখি যা ইচ্ছা করি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।”
সূরা ২২ঃ৫ এর এই পরবর্তী অংশ বোধহয় ইঙ্গিত করে যে, স্রষ্টা নির্ধারণ করেন কোন্ ভ্রূণগুলি জরায়ুতে পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত থাকবে। এটি সুবিদিত যে, অনেক ভ্রূণ বিকাশের প্রথম মাসে গর্ভপাত ঘটে যায় এবং এটিও জানা যে, গঠিত জাইগোটের মাত্র প্রায় ৩০% অপরিণত শিশু যা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে।
মানব বিকাশ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা সপ্তম শতাব্দীতে কিংবা এমনকি একশ’ বছর আগেও সম্ভব ছিল না। এখন আমরা সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারি কারণ আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যা আমাদের নতুন উপলব্ধি দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে কুরআনে অন্য কিছু আয়াত আছে মানব বিকাশের সাথে সম্পর্কিত যা বুঝা যাবে ভবিষ্যতে যখন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ■

আল কুরআন ঃ এক মহাবিস্ময়

গ্যারি মিলার

কুরআনকে বিস্ময়কর শুধু মুসলিমরাই বলে না— যাদের কাছে গ্রন্থটি অতি মূল্যবান এবং যারা এটি নিয়ে সন্তুষ্ট— অমুসলিমদের দ্বারাও এটি বিস্ময়কর বলে চিহ্নিত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হল, যারা ইসলামকে খুব ঘৃণা করে, এমনকি তারাও এটিকে বিস্ময়কর বলেছে।[1]

এই গ্রন্থটি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন এ রকম অমুসলিমদেরকে যে বিষয়টি বিস্মিত করে তা হল, কুরআনকে তারা যেমনটি আশা করেছিলেন তাদের কাছে তেমনটি মনে হয় না। তাদের অনুমান হল, এটি একটি প্রাচীন গ্রন্থ যা সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে আরব মরুভূমি থেকে এসেছে। তারা আশা করেন, বইটি দেখতেও তেমনি হবে— মরুভূমি থেকে আসা এক প্রাচীন গ্রন্থ। তারপর তারা দেখতে পান যে, এটি আদৌ তেমনটি নয় যেমনটি তারা আশা করেছিলেন। তাছাড়া, কিছু লোক প্রথমেই যেসব বিষয় অনুমান করেন তার মধ্যে একটি হল, যেহেতু এটি মরুভূমি থেকে আসা প্রাচীন গ্রন্থ, সেহেতু এতে মরুভূমির কথাই বলা হবে। ভাল কথা, কুরআন মরুভূমির কথা বলে— এর কিছু চিত্রকল্প মরুভূমিকে বর্ণণা করে; কিন্তু এ গ্রন্থ সমুদ্রের কথাও বলে— সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়াটা কেমন সে কথা এখানে উল্লেখ আছে।

---

1. কুরআনের এই বিস্ময়কর ক্ষমতা যুগে যুগে মানুষকে এই মহাগ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করে আসছে। আরবী ভাষা ভাল জানে এমন কেউ মনযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনলে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। ইসলামের ঘোরতর শত্রু কুরাইশ সরদাররাও এই মহাগ্রন্থের প্রভাব অস্বীকার করতে পারে নি। কুরআনের এই সম্মোহনী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য কুরাইশ সরদার আবু জাহল এক কৌশল অবলম্বন করে। তার সেই কৌশলের কথা কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ 'তোমরা কুরআন শুনবে না, আর কুরআন পাঠের সময় চেঁচামেচি শুরু করবে; তাতে মনে হয় তোমরা বিজয়ী হবে।' কুরআন তার শ্রোতাকে মুগ্ধ-মোহিত করে দিত বলেই-না অবিশ্বাসীদের এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। কুরআনের এই সম্মোহনী শক্তি কোন বিশেষ স্থান-কাল বা পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যেমন এই মহাগ্রন্থ বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে বিস্মিত করত, আজো এটি তেমনি বিস্মিত করে চলেছে চিন্তাশীল মানুষকে। এ কালের বিমুগ্ধ হৃদয় কিভাবে কুরআনের প্রতি বিস্ময় মেনেছেন তার কিছু নজির পরিশিষ্টে দেওয়া হল। —অনুবাদক।

কয়েক বছর আগে টরন্টোতে আমরা একটি ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি বাণিজ্য জাহাজের নাবিক ছিলেন এবং সমুদ্রে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন। একজন মুসলিম তাকে কুরআনের একটি অনুবাদ পড়তে দিয়েছিলেন। নাবিকটি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানতেন না কিন্তু তিনি কুরআন পড়তে আগ্রহী ছিলেন। গ্রন্থটি পড়ে শেষ করার পর তিনি সেই মুসলিমকে ফেরত দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "এই মুহাম্মাদ কি নাবিক ছিলেন?" কুরআনে সামুদ্রিক ঝড়ের নিখুঁত বর্ণনা দেখে তিনি প্রভাবিত হন। তাকে বলা হল, "না, আসলে মুহাম্মাদ (সা) মরুভূমিতে বাস করতেন।" সেটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। তক্ষুনি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআনের বর্ণনায় তিনি খুব প্রভাবিত হন, কারণ সমুদ্রে তিনি এক ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন এবং তিনি জানতেন, যিনিই সেই বর্ণনা লিখেছেন, তিনিও সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়েছেন। "ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর মেঘ" বর্ণনাটি এমন নয়, যা কোন ব্যক্তি সামুদ্রিক ঝড়ের কল্পনা করে লিখে দিল; বরং এটি এমন কারো লেখা যিনি জানেন সমুদ্রে ঝড় কেমন হয়। কুরআন যে কোন বিশেষ স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় -- এটি তার একটি উদাহরণ।[2]

---

2. কুরআন পাকে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ঃ 'অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) সাগরের গভীরে অন্ধকারের মত। এটা ঢেউয়ে আবৃত, যার উপরে আরো ঢেউ, যার উপরে আছে মেঘমালা। অন্ধকার, একের পর আরেক। কেউ যতি তার হাত প্রসারিত করে, তবে সে তা দেখতে পাবে না. . . ।' (আল কুরআন ঃ ২৪ঃ ৪০) অনুবাদকের মতে এই আয়াতে ঝড়ের কথা বলা হয়নি। এর আগের আয়াতে অবিশ্বাসীদের অবস্থার তুলনা করা হয়েছে মরুভূমির মরীচিকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলা ব্যক্তির সাথে। আর এখানে তুলনা করা হয়েছে সমুদ্রের গভীরে অন্ধকারের সাথে। নইলে 'একের পর আরেক অন্ধকার' কথাটির কী অর্থ হতে পারে? আসলে আমরা এখানে দুটি বৈজ্ঞানিক তথ্য লক্ষ্য করতে পারি। এক. সাগরের গভীরে অন্ধকার। দুই. উপরিভাগের যে ঢেউ, তার অনেক নিচে ঢেউয়ের অস্তিত্ব।

   নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঃ সূর্যের আলোর শতকরা ৩ থেকে ৩০ ভাগ প্রতিফলিত হয় সাগরের উপরিভাগে। তারপর নীল আলো ব্যতীত বর্ণালীর অন্য প্রায় সব আলো ২০০ মিটার গভীরতার মধ্যে শোষিত হয়। এই গভীরতায় কোন আলো নেই বললেই চলে। আর ১০০০ মিটার গভীরতায় একেবারেই কোন আলো নেই। সম্পূর্ণ আলোকহীনতার এই কথা সাবমেরিন তথা ডুবো জাহাজ আবিস্কারের আগে জানতে পারা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ কোন যন্ত্রপাতি ছাড়া মানুষ সাগরের মাত্র ৪০ মিটার নিচেও নামতে পারে না। অথচ হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত অবিশ্বাসীদের উপমা দিতে গিয়ে কত আধুনিক তথ্য প্রায় দেড় হাজার বছর আগে কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে! —অনুবাদক।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এতে উল্লেখিত বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তব্য দেখে মনে হয় না, সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে মরুভূমি থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির অনেক শতাব্দী আগে, গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের একটি সুপরিচিত আণবিক মতবাদ ছিল। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী কালের লোকদের অনুমান ছিল, বস্তু অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত হয় । এই কণাকে অণু বলা হত। আরবরাও একই ধারণা পোষণ করত; আসলে আরবী শব্দ 'জাররা' বলতে মানবীয় জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা যায় এমন ক্ষুদ্রতম কণা বুঝায়। আজ আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, বস্তুর এই ক্ষুদ্রতম একক (অর্থাৎ অণু— যাতে বস্তুর সকল উপাদান ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান) কে তার গঠন-উপাদানে বিভক্ত করা যায়। এটি একটি নতুন ধারণা যা গত শতাব্দীতে লাভ করা গেছে। তথাপি, খুবই মজার ব্যাপার হল, এই তথ্যটি কুরআনে আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশমন্ডল বা পৃথিবীস্থিত একটি পরমাণুর ওজন সম্পর্কেও জ্ঞাত এমনকি তারও চেয়ে ক্ষুদ্রতর কিছুরও ...।"

কোন সন্দেহ নেই, সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে এই বক্তব্য একজন আরববাসীর কাছেও অস্বাভাবিক মনে হবার কথা। তার কাছে জাররা হল বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক। আসলে, কুরআন যে সেকেলে হয়ে যায়নি এটি তার একটি প্রমাণ।

ঢেউয়ের উপর ঢেউ ঃ সাগরের উপরিভাগে বড় বড় ঢেউ জাগতে এবং ভাঙতে কে না দেখেছে। কিন্তু এর বহু নিচেও ঢেউয়ের অস্তিত্ব আছে— একথা এই একবিংশ শতাব্দীর ক'জন মানুষ জানে? এমনকি উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে যার আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞানের এই তথ্যটি জানা আছে। উপরের আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের ঢেউ হল সমুদ্রের উপরিভাগের ঢেউ। তার প্রমাণ হল, আয়াতটিতে এই ঢেউয়ের উপরে মেঘের কথা বলা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, প্রথম ঢেউ কোথায়? আয়াত থেকে বুঝা যায়, এটি দ্বিতীয় ঢেউয়ের নিচে অর্থাৎ সাগরের গভীরে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই ঢেউয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, সমুদ্রের পানি বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট। বেশি গভীরতায় পানির ঘনত্ব বেশি; কম গভীরতায় ঘনত্বও কম। আভ্যন্তরীন এই ঢেউ জাগে দুটি ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট পানিস্তরের সাধারণ পৃষ্ঠদেশ যেটা, সেইখানে। গভীর সমুদ্রের এই ঢেউ চোখে দেখা যায় না; এর অস্তিত্ব বুঝা যায় কোন স্থানের পানির লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা পরীক্ষা করে। Oceanography এর যে কোন নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক থেকে উপরের বিষয় দু'টি জানা যেতে পারে। অদেখা এই বিষয় দুটি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার; অথচ তার উল্লেখ আছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কুরআনে! আল্লাহ্‌র জ্ঞান তো সব কিছুকে ঘিরে আছে। —অনুবাদক।

আরেকটি উদাহরণ, 'প্রাচীন গ্রন্থে' কেউ স্বাস্থ্য বা ঔষধের সেই আলোচনাই আশা করবেন যা প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক হিসাবে সেকেলে হয়ে গেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা) স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়েছেন । তথাপি কুরআন এসব উপদেশের অধিকাংশই ধারণ করেনি। প্রথম দৃষ্টিতে অমুসলিমদের মনে হতে পারে, অমনোযোগিতার কারণে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তারা বুঝতে পারেন না আল্লাহ কেন এরূপ সহায়ক তথ্য কুরআনে "অন্তর্ভুক্ত" করেন নি। কিছু মুসলিম এই অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে এই যুক্তি পেশ করেন ঃ "যদিও মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় এই উপদেশগুলি যথাযথ ও প্রযোজ্য ছিল, তবুও আল্লাহ্ তাঁর অসীম জ্ঞানের সাহায্যে জানতেন যে, পরবর্তী কালে চিকিৎসা শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে অগ্রগতি সাধিত হবে যাতে করে মহানবী (সা)-এর উপদেশ সেকেলে মনে হবে। যখন পরবর্তী আবিষ্কার ঘটবে, লোকে হয়ত বলবে যে, এই তথ্য মহানবী (সা)-এর দেওয়া তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবে, আল্লাহ যেহেতু অমুসলিমদের এই দাবী করার সুযোগ দিতে চান না যে, কুরআন নিজের সাথে বা মহানবীর শিক্ষার সাথে স্ব-বিরোধী, সেহেতু তিনি কুরআনে সেই সব তথ্য এবং উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা সময়ের পরীক্ষায় টিকে যেতে পারে।"

যাহোক, কেউ যখন কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে, তখন সমস্ত ব্যাপারটি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে চলে আসে। তখন এই ধরণের যুক্তি দেওয়া যে ভুল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কুরআন এক অবতীর্ণ গ্রন্থ। সেই হিসেবে এতে উল্লেখিত সকল তথ্য আসমানী উৎস থেকে আগত। আল্লাহ নিজে থেকে কুরআন অবতীর্ণ করেন। এটি আল্লাহর বাণী যার অস্তিত্ব বিশ্ব সৃষ্টির আগে ছিল আর এর সাথে কিছুই যোগ-বিয়োগ কিংবা পরিবর্তন করা যেতে পারে না। সারকথা, নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে সৃষ্টি করার আগেই কুরআন ছিল এবং পূর্ণাঙ্গ রূপেই ছিল। কাজেই এই মহাগ্রন্থে মহানবী (সা)-এর নিজের কোন কথা বা উপদেশ থাকতে পারে না। সেটা যদি করা হত তাহলে তা স্পষ্টতঃই সেই উদ্দেশ্যের বিরোধী হত, যার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন গ্রন্থটির লেখকের ব্যাপারে সমঝোতা করতে হত

এবং এটি যে আসমানী উৎস থেকে এসেছে সেই দাবী অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ত। ফলতঃ কুরআনে কোন টোটকা চিকিৎসা নেই যাকে কেউ সেকেলে দাবী করতে পারে। কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য কী উপকারী, কোন্ খাদ্য খাওয়া সবচেয়ে ভাল কিংবা কিসে এই রোগ, সেই রোগ সারাবে— এসব ব্যাপারে কোন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এই মহাগ্রন্থে নেই। আসলে কুরআনে চিকিৎসার ব্যাপারে একটি উপাদানের উল্লেখ আছে আর এটি নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে যে, মধুতে অনেক রোগের আরোগ্য আছে। আর আমার তো মনে হয় না, এ ব্যাপারে তর্ক করার মত কেউ আছে।

কেউ যদি অনুমাণ করে যে, কুরআন মানব মস্তিষ্ক-প্রসূত, তাহলে তার আশা করা উচিত যে, এতে তা-ই প্রতিফলিত হবে যা কিছু 'রচয়িতা'র মনে ঘটে চলছিল। আসলে কিছু বিশ্বকোষ এবং বিভিন্ন পুস্তক দাবী করেছে, কুরআন হল মুহাম্মাদ (সা)-এর মনে ঘটে যাওয়া কিছু বিভ্রমের ফসল। যদি এই দাবী সত্য হয়, যদি এই গ্রন্থ মুহাম্মাদ (সা)-এর কিছু মানসিক সমস্যার ফসল হয়-- তাহলে কুরআনে তার স্পষ্ট প্রমাণ থাকত। তেমন কোন প্রমাণ কি আছে? তেমন কিছু আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য একজনকে প্রথমে অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে তাঁর মনে সেই সময় কী ঘটছিল। তারপর কুরআনে অনুসন্ধান করতে হবে এসব চিন্তা-ভাবনার উপস্থিতি।

এটি সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, মুহাম্মাদ (সা) খুব কঠিন-কষ্টকর জীবন যাপন করতেন। একজন বাদে তাঁর কন্যাদের সবাই তাঁর জীবদ্দশায় মারা যান।[3] কয়েক বছর তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন যিনি তাঁর কাছে খুব প্রিয় এবং

3. মহানবী (সা)-এর পুত্রসন্তানেরাও অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর শিশু পুত্র কাসেম, আবদুল্লাহ একের পর এক মৃত্যু বরণ করেন। সন্তানের মৃত্যুতে মহানবী (সা) মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনোকষ্ট আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল স্বজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। নিকটাত্মীয়ের পুত্র-বিয়োগে তাদের মনে সমবেদনা জাগেনি। তারা সন্তানহারা পিতার ব্যথাতুর অন্তরে একের পর এক নির্মম আঘাত হেনে চলছিল। আবু লাহাব, আবু জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল প্রমুখ লোকেরা আনন্দ-ফুর্তি করত আর বলত, 'সে তো একজন আবতার (শিকড় কাটা) ব্যক্তি। তার কোন পুত্রসন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবারও কেউ থাকবে না।' ইতোপূর্বে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে মহানবীর (সা) উপর; তিনি পরম ধৈর্য সহকারে সেসব সয়ে গেছেন। কিন্তু নিকটাত্মীয়দের এই নির্দয় ব্যবহার তাঁর জন্য নিদারুণ কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছিল। হতাশা তাঁকে

গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, যিনি তাঁর জীবনের খুব সংকটকালে তাঁকে একা ফেলে যান। প্রথম ওহী যখন মহানবীর (সা) উপর অবতীর্ণ হয় তখন তিনি ভীত হয়ে বাড়িতে তাঁর সান্নিধ্যে যান। কোন সন্দেহ নেই, এমনকি আজো কারো এমন আরববাসী খুঁজে পেতে কষ্ট হবে যে বলে, "আমি এতই ভয় পেয়েছিলাম যে, দৌড়ে বাড়িতে স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম।" তারা এমনটি করে না। তথাপি মুহাম্মাদ (সা) স্ত্রীর সান্নিধ্য এতটা স্বস্তিদায়ক ভেবেছিলেন যে, তেমনটিই করেছিলেন। তিনি অর্থাৎ মহানবীর স্ত্রী খাদিজা (রা) কতই না প্রভাবশালী ও শক্ত নারী ছিলেন![4] যদিও মুহাম্মাদ (সা)-এর মানসিক বিষয়গুলির মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এগুলি, তবু এগুলি আমাদের বিষয় প্রমাণ করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী। কুরআন এসবের কিছুই উল্লেখ করেনি— তাঁর ছেলে-মেয়ের মৃত্যু, না তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী ও স্ত্রীর মৃত্যু, না প্রথম ওহী অবতরণকালীন তাঁর ভীতির কথা, না (যা তিনি কত সুন্দরভাবে তাঁর স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন)— কিচ্ছু না। তথাপি এই বিষয়গুলি নিশ্চয় তাঁকে আহত করেছিল, ভাবিত করেছিল এবং বেদনা ও যাতনা দিয়েছিল।

কুরআনের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক অভিগমণ সম্ভব, কারণ কুরআনে এমন কিছু বলা হয়েছে যা বিশেষভাবে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এবং সাধারণভাবে

গ্রাস করার উপক্রম হয়েছিল। এসময় তাঁকে সান্ত্বনা দিতে সূরা আল কাউসার নাযিল হয়। অথচ এতে তাঁর ব্যক্তি জীবনের বেদনাদায়ক অধ্যায়ের কোন উল্লেখ নেই। বরং আছে সুসংবাদ। তিনি যদি কুরআনের রচয়িতা হতেন, তবে এতে তাঁর এই বেদনাদায়ক দিনগুলির প্রতিফলন না ঘটে পারত না। —অনুবাদক।

4. হেরা গুহার নির্জন পরিবেশে সহসা জিবরীল আমীনের অলৌকিক সত্তার উপস্থিতি, তাঁকে পড়তে বলা, তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর অক্ষমতা অলৌকিকভাবে দূর করা— এসব ঘটনা হযরত মুহাম্মাদকে (সা) ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসেন। খাদিজা (রা)-কে তিনি বলেন, "আমাকে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দাও। আমি বিপদের আশঙ্কা করছি।" এসময় খাদিজা (রা)-এর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (সা)-এর অতি উত্তম আচার-আচরণ এবং অনুপম চরিত্র মাধুরীর জন্য তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর। তাই তাঁর ভয় দূর করতে তিনি গভীর আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বলেন, "কখনো নয়, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তালা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে তার বোঝা হালকা করেন, অভাবী লোকের অভাব দূর করেন, মেহমানদের খাতির-যত্ন করেন, সত্যপথে চলতে গিয়ে তকলিফ ও বিপদে সাহায্য করেন।" শুধু মৌখিক সান্ত্বনা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি মহানবীকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই সুপন্ডিত ওরাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান আর ওরাকা তাঁকে জানান, এটা কোন শয়তানের কাজ নয় বরং আল্লাহ তাঁকে রাসূল মনোনীত করেছেন। —অনুবাদক।

অন্য কোন ধর্মে বলা হয় নি। এটি ঠিক তাই যা বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। আজকের দিনে এমন অনেক লোক পাওয়া যায়, যাদের কাছে মহাবিশ্বের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা এবং তত্ত্ব বর্তমান। এসব লোক সর্বত্র আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাদের কথা শুনতে পর্যন্ত আগ্রহী নয়। এই অনাগ্রহের কারণ হল এই যে, বিগত শতাব্দী থেকে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষা দাবী করে আসছেন। তাঁরা বলেন, "তোমার কাছে মতবাদ থাকলে এটা দিয়ে আমাদের বিরক্ত করো না, যদি না সেই তত্ত্বের সাথে তুমি ভ্রান্ত কি না তা প্রমাণ করার জন্য একটি উপায় আমাদের জন্য নিয়ে আস।"

ঠিক এরকম একটি পরীক্ষার কারণেই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় শতাব্দীর (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর) প্রথম দিকে আইনস্টাইনের কথা শুনেছিলেন। তিনি একটি নতুন তত্ত্ব নিয়ে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি মহাবিশ্ব এভাবে চলে; আর আমার কথা ভুল কি না তা প্রমাণ করার তিনটি উপায় আছে!" অতএব, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাঁর তত্ত্বকে পরীক্ষার অধীনে আনলেন, এবং ছয় বছরের মধ্যে এটি তিনটি পরীক্ষার সবক'টিতেই উতরে গেল। অবশ্য, এটি তাঁর মহত্বের প্রমাণ বহন করে না, কিন্তু এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মনোযোগ পাবার যোগ্য ছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন, "এটি আমার ধারণা, আর যদি তোমরা আমাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করতে চাও, তাহলে এটি বা ওটি কর।"

কুরআনে ঠিক এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষাটিই আছে। এদের মধ্যে কিছু পুরাতন (এই অর্থে যে, সেগুলি আগেই পরীক্ষিত হয়েছে[5]), আর আজো কিছু বিদ্যমান আছে। ভুল প্রমাণের এই যে পরীক্ষা— তার একটি দাবী আছে; তা হল কুরআন নিজের সম্পর্কে যা বলে যদি এটি তা না হয়, তাহলে আপনাকে এটি মিথ্যা প্রমাণের জন্য এটা, ওটা বা সেটা করতে হবে। অবশ্য সাড়ে ১৪০০ বছরের মধ্যে কেউ এটা, ওটা বা সেটা করতে পারেনি। আর এভাবে এখনো এই গ্রন্থটিকে সত্য এবং বিশুদ্ধ বিবেচনা করা হয়। আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হল, পরবর্তীতে কারো সাথে ইসলাম

---

5. অর্থাৎ সেইসব পরীক্ষার সাহায্যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় নি; বরং কুরআন যে আল্লাহর বাণী এই দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। —অনুবাদক।

সম্পর্কে যদি বিতর্ক হয় আর সেই ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, সত্য তার কাছে আছে এবং আপনি অন্ধকারে আছেন, তাহলে আপনি প্রথমে আর সব যুক্তি ছেড়ে এই পরামর্শ দিন। তাকে জিজ্ঞাসা করুন, "আপনার ধর্মে কি কোন মিথ্যা প্রমাণ করার পরীক্ষা আছে? যদি আমি একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ করতে পারি তাহলে প্রমাণিত হবে যে, আপনি ভুলের মধ্যে আছেন— এরকম কিছু কি আছে আপনার ধর্মে? আছে এমন কিছু? প্রসঙ্গতঃ, আমি ঠিক এখনই জোর দিয়ে বলতে পারি যে, লোকে কিচ্ছু পাবে না— কোন টেস্ট না, কোন প্রমাণ না, কিচ্ছু না! পাবে না এই কারণে যে, তাদের ধারণা, তারা যা বিশ্বাস করে শুধু তা-ই উপস্থাপন করা উচিত। তারা ভুল কি না তা প্রমাণের সুযোগ অন্যদেরও দেওয়া উচিত— এই ধারণা তারা পোষণ করে না। যাহোক, ইসলাম এটা করে। ইসলাম কিভাবে মানুষকে এটার (কুরআনের) বিশুদ্ধতা যাচাই করার এবং "এটাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার সুযোগ দেয় তার একটি নিখুঁত উদাহরণ আছে ৪র্থ সূরায়। এবং সম্পূর্ণ সততার সাথেই বলছি, আমি যখন প্রথম এই চ্যালেঞ্জ আবিষ্কার করেছিলাম, তখন বিস্মিত হয়েছিলাম। এখানে বলা হয়েছে ঃ

"তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে খেয়াল করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তাহলে তারা নিশ্চয় এতে অনেক স্ব-বিরোধিতা দেখতে পেত।"

অমুসলিমদের প্রতি এটি একটি পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ। মূলতঃ এটি তাকে ভুল খুঁজে বের করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব ও জটিলতার কথা বাদ দিলেও কথা থেকে যায়; এই ধরণের চ্যালেঞ্জ প্রদান মানব চরিত্রে নেই আর এটি মানবীয় ব্যক্তিত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এমন কেউ অংশ নেয় না, যে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষকের উদ্দেশ্যে নোট লিখে দেয়, "এই উত্তরপত্র সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এতে কোন ভুল নেই। পারলে একটি খুঁজে বের করুন!" কেউ এমনটি করে না। শিক্ষকের তো কোন ভুল খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুমই আসবে না! তথাপি এভাবেই কুরআন মানুষের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে। আরেকটি মজার ভঙ্গী যা কুরআনে বার বার এসেছে তা হল, পাঠকের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান। কুরআন বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে পাঠককে জানায় আর তারপর উপদেশ দেয় ঃ "যদি তুমি

এটা বা ওটা সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চাও, কিংবা যা বলা হল সে ব্যাপারে যদি তুমি সন্দেহ কর, তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যারা জ্ঞান রাখে।" এটিও একটি বিস্ময়কর ভঙ্গী। এটি স্বাভাবিক নয় যে, একটি বই কারো কাছ থেকে এল যার ভূগোল, উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেই অথচ এসব বিষয়ে আলোচনা করা হল আর তারপর পাঠককে উপদেশ দেওয়া হল, যদি তার কোন ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুক।

তথাপি প্রত্যেক যুগে এমন মুসলিম পাওয়া গেছে যারা কুরআনের উপদেশ অনুসরণ করেছেন এবং অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন। কেউ যদি অনেক শতাব্দী আগের কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর লেখা পাঠ করেন, তবে তিনি দেখবেন যে, তা কুরআনের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা এই সেই ক্ষেত্রে কোন কিছুর সন্ধানে গবেষণা করেছেন। আর তাঁরা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, এটা বা ওটার ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসন্ধানের কারণ হল, কুরআন তাদেরকে সেই দিকটি দেখিয়ে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে আর তারপর পাঠককে বলে, "এটা নিয়ে গবেষণা কর!" এই মহাগ্রন্থ পাঠককে ইঙ্গিত দেয় কোথায় লক্ষ্য করতে হবে। আর তারপর বলে যে, একজনের উচিৎ এ সম্পর্কে আরো তথ্য খুঁজে বের করা। এটিই সেই জিনিস যা আজকের মুসলিমেরা ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করছে বলে মনে হয়— তবে সব সময় নয়, যেমন নিচের উদাহরণে বিধৃত হয়েছে।

কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াদে একদল লোক কুরআনের ভ্রূণতত্ত্ব— মাতৃগর্ভে মানব শিশুর বৃদ্ধি সম্পর্কিত সকল আয়াত একত্র করেন। তাঁরা বলেন, "কুরআন যা বলে তা হল এই। এটি কি সত্য?" সারকথা , তাঁরা কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করেন, "সেই লোকদের জিজ্ঞাসা কর যারা জানে।" ঘটনাটি ছিল এ রকম ঃ তারা একজন অমুসলিমকে বেছে নেন যিনি টরন্টো বিশ্বাবদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক। তাঁর নাম কীথ এল. মূর আর তিনি ভ্রূণতত্ত্বের উপর বেশ কিছু পাঠ্য বই লিখেছেন— এই বিষয়ের উপর তিনি একজন জগৎখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তাঁরা তাঁকে রিয়াদে আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন, "আপনার বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন যা বলে

তা হল এই। আপনি কি বলেন?'' যে সময়টা তিনি রিয়াদে ছিলেন, সে সময় তাঁরা তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন— অনুবাদসহ যে সহযোগিতাই তিনি চেয়েছেন। আর তিনি যা খুঁজে পেয়েছিলেন তাতে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পাঠ্য পুস্তকগুলিতে পরিবর্তন আনেন। তাঁর বইগুলির একটির দ্বিতীয় সংস্করণে, যার নাম 'আমাদের জন্মের আগে' (Before We are Born), ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কিত দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করেন যা প্রথম সংস্করণে ছিল না। কারণ এসব তিনি কুরআনে খুঁজে পেয়েছিলেন।[6] আসলে এটি একটি উদাহরণ যে, কুরআন তার সময়কালের চেয়েও এগিয়ে ছিল এবং যারা কুরআন বিশ্বাস করেন তারা এমন কিছু জানেন যা অন্য লোকে জানে না।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্য একবার ডঃ কীথ মূরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা এই বিষয়ের উপর অনেক কথা বলেছিলাম— সাক্ষাৎকারটি আলোকচিত্র, ফিল্ম এবং আরো কয়েকভাবে দেখানো হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত কিছু বিষয় ত্রিশ বছর আগেও বিজ্ঞানের অজানা ছিল।[7] তিনি বলেন যে, বিশেষ করে একটি বিষয়, মানুষের একটি পর্যায়ের

---

6. আসলে কুরআনে ভ্রূণের বর্ণনায় নির্ভুলতা এবং বেড়ে উঠার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত পরিভাষা লক্ষ্য করে বিজ্ঞানী মূর এতই বিস্মিত হয়েছেন যে, এই বিষয়ে লেখা তাঁর আরেকটি বইয়েও পরিবর্তন আনেন। বইটির নাম The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় WB Saunders থেকে। এই গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রধান আটটি ভাষায় অনূদিত হয়ে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের সংস্করণে তিনি ভ্রূণতত্ত্বের উপর কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনা সন্নিবেশ করেন। শুধু তাই নয়, এই দু'টি উৎসের অনুকরণে তিনি ভ্রূণ গঠণের পর্যায়গুলি ভাগ করেছেন। —অনুবাদক।

7. ভ্রূণ সম্পর্কিত প্রথম মতবাদ (যদিও তা ভ্রান্ত ছিল) আমরা পাই সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানী হার্ভের কাছে। তিনি জানান "জীবনের উৎপত্তি ডিম্বাণু থেকে।" তৎকালীন মানুষ এই মতবাদকে লুফে নেয়। কারণটা স্পষ্ট, মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে ডিম থেকে পাখি ও সরীসৃপের বাচ্চা হয়। মানুষসহ সব স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রেও এটাই হবে, অসম্ভব কী! সপ্তদশ শতাব্দীতে এই 'এগ থিওরী' এতটা জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তৎকালীন অনেক বিজ্ঞানীও এটি বিশ্বাস করতেন। বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী বাফুনও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনেক আজগুবি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই সময়ে অনেক চিন্তাবিদও বিশ্বাস করতেন যে, আদিমাতা হাওয়ার ডিম্বাশয়ে সমস্ত মানবজাতির বীজ রক্ষিত ছিল। মানব ভ্রূণ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা পাবার জন্য বিশ্ববাসীকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রথম সঠিক ধারণা দেন বিজ্ঞানী স্ট্রীটার ১৯৪১ সালে। কিন্তু তাঁর এই ধারণাতেও পরিবর্তন আনতে হয়। ১৯৭২ সালে বিজ্ঞানী ও'রাহিলী আরো নির্ভুলভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। —অনুবাদক।

কুরআনিক বর্ণনা "জোঁক সদৃশ রক্তপিণ্ড" (আলাক্ব), তাঁর কাছে নতুন ছিল; কিন্তু যখন তিনি এটি যাচাই করেন, তখন দেখেন যে, এটি সত্য আর তাই এটি তিনি তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, "আগে আমি এটি কখনোই ভাবিনি।" তিনি প্রাণিবিদ্যা বিভাগে গিয়ে জোঁকের ছবি চান। যখন তিনি দেখেন যে, এটি ঠিক মানব ভ্রূণের মত দেখতে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, উভয় চিত্রই তিনি তাঁর পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন। ডঃ মূর চিকিৎসা ভ্রূণতত্ত্বের (clinical embryology) উপরও একটি বই লেখেন আর যখন তিনি টরেন্টোতে এই তথ্য উপস্থাপন করেন, তখন এটি কানাডা জুড়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি সমগ্র কানাডার কিছু পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায় এবং কিছু কিছু সংবাদ-শিরোনাম ছিল খুব কৌতুককর। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শিরোনাম এরকম ছিলঃ "প্রাচীন গ্রন্থে বিস্ময়কর জিনিস পাওয়া গেছে!" এই উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, এসব কি সম্পর্কে তা লোকে পরিষ্কার বুঝতে পারছে না। আসল কথা, একটি খবরের কাগজের সাংবাদিক অধ্যাপক মূরকে প্রশ্ন করেন, "আপনার কি মনে হয় না যে, ভ্রূণের বিবরণ, এটার আকৃতি এবং কিভাবে এটা পরিবর্তিত হয় এবং বেড়ে ওঠে তা আরবরা হয়ত জানত ? হয়তবা তাদের মধ্যে কোন বিজ্ঞানী ছিল না, কিন্তু তারা হয়ত তাদের লোকদের উপর আনাড়ী ব্যবচ্ছেদ করে এসব জিনিস পরীক্ষা করেছিল।"

প্রফেসর সাহেব তৎক্ষণাৎ তাকে (অর্থাৎ সাংবাদিককে) দেখিয়ে দেন যে, তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছেন— তা হল, ভ্রূণের সবগুলি স্লাইড এবং আলোকচিত্রের মাধ্যমে যা প্রদর্শিত হল, তা সবই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তোলা ছবি। তিনি বলেন, "যদি কেউ চৌদ্দশ' বছর আগে ভ্রূণতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করে, তবে সেটি কোন ব্যাপার নয়, তারা এটি দেখতে পেত না!" কুরআনে ভ্রূণের আকৃতি সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা সেই সব আকৃতি সম্পর্কে যখনো এটি এত ছোট থাকে যে, চোখে দেখা যায় না। ফলে এটি দেখার জন্য একজনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। যেহেতু এই ধরণের যন্ত্র হাতের কাছে পাওয়া যায় দু'শ বছরের সামান্য কিছু বেশি কাল, সেহেতু ডঃ মূর ব্যঙ্গ করেন, "হয়ত চৌদ্দশ' বছর আগে কারো কাছে গোপনীয়ভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল এবং কোথাও কোন ভুল না করে এই

গবেষণা করেছেন। তারপর তিনি কোনভাবে মুহাম্মাদ (সা)-কে এটি শেখান এবং এই তথ্যটি তাঁর পুস্তকে লিখে নিতে রাজি করান। তারপর তিনি তাঁর যন্ত্র ধ্বংস করে ফেলেন এবং চিরকালের জন্য এটি গোপন রাখেন। আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন? আপনার আসলে তা করা উচিত না যতক্ষণ আপনি কিছু প্রমাণ হাজির না করছেন, কারণ এটি খুবই হাস্যকর তত্ত্ব।" আসলে যখন ডঃ মূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কুরআনের এই তথ্যকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?" ডঃ মূরের জবাব ছিল,"এটি কেবল ওহীর মাধ্যমেই সম্ভব!"

যদিও এখানে উল্লেখিত উদাহরণটি একজন অমুসলিমের সাহায্যে কুরআনে বর্ণিত তথ্যের মানবীয় গবেষণা সংক্রান্ত, তথাপি এটি যথার্থ। কারণ গবেষণাধীন বিষয়ের তিনি অন্যতম বিজ্ঞ ব্যক্তি। যদি কোন সাধারণ মানুষ দাবী করত যে, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন যা বলে তা সত্য, তাহলে কেউই হয়ত তার কথা গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করত না। যাহোক, মানুষ পন্ডিত ব্যক্তিদের যে উচ্চ অবস্থান, সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে, তার কারণে একজন স্বভাবতঃই ধরে নেয় যে, যদি তাঁরা একটি বিষয়ের উপর গবেষণা করেন এবং সেই গবেষণার ভিত্তিতে একটি উপসংহারে পৌঁছান, তবে সেই উপসংহারটি যথার্থ। প্রফেসর মূরের সহকর্মীদের মধ্যে একজন হলেন মার্শাল জনসন, যিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-তত্ত্বের উপর ব্যাপক গবেষণা করেন।

এই ঘটনায় তিনি খুব উৎসুক হয়ে ওঠেন যে, ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য নির্ভুল। তাই তিনি মুসলিমদেরকে কুরআনের সেই বিষয়ের সব কিছু সংগ্রহ করতে বলেন, যে বিষয়ে তিনি নিজে বিশেষজ্ঞ। আবারো লোকেরা যা খুঁজে পেল তা দেখে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। যেহেতু কুরআনে বিপুল সংখ্যক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা শেষ করতে নিশ্চয় বিপুল সময় প্রয়োজন। এই আলোচনার উদ্দেশ্যের জন্য একথা বলাই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর কুরআন খুব পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছে[৪] আর একই সাথে পাঠককে উপদেশ

---

৪. বিভিন্ন বিষয়ের উপর কুরআনের বক্তব্য এতটা সুস্পষ্ট যে, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এর যে সম্পর্ক, তা মোটেই জোড়া-তালি দেওয়া বা গোঁজামিল

দিচ্ছে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেই বিষয়ের পণ্ডিতদের গবেষণার ব্যবস্থা করতে। সন্দেহ নেই, কুরআনের এমন একটি ভঙ্গি আছে, যা আর কোথাও দেখা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কারো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে না পারার অর্থ এই নয় যে, ঠিক এই কারণে তাকে অন্য কারো ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। যাহোক, একজন ব্যক্তি যখন অন্য ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে, তখন প্রমাণের বোঝা তার নিজের উপরই এই শর্তে ফিরে আসে যে, সে একটি উপযুক্ত উত্তর খুঁজে বের করবে। এই সাধারণ তত্ত্ব জীবনের অসংখ্য ধারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কিন্তু সবচেয়ে চমৎকারভাবে কুরআনের চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খায়। কারণ এটি সেই ব্যক্তির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে যে বলে, "আমি এটা বিশ্বাস করি না।" প্রত্যাখ্যানের সূত্রপাত হবার পর তৎক্ষণাৎ তার উপর একটি দায়িত্ব বর্তায়, তাকে স্বয়ং একটি ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে যদি সে মনে করে, অন্যদের উত্তর অপর্যাপ্ত। কুরআনের এক বিশেষ আয়াতে (যেটি আমি সব সময় ইংরেজিতে ভ্রান্ত অনুবাদ হতে দেখেছি) আল্লাহ একটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যে লোক সত্যের ব্যাখ্যা শুনেছে। আয়াতটি ইরশাদ করছে যে, সে পরিত্যক্ত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ সে তথ্যটি শোনার পর তার সত্যতা যাচাই না করে চলে গেছে। অন্য কথায়, একজন কিছু শোনার পর যদি এটি নিয়ে গবেষণা না করে এবং এটি সত্য কি না তা যাচাই না করে, তবে সে অপরাধী। ধরে নেওয়া হয়, একজন সব তথ্য প্রক্রিয়াজাত করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে কোন্‌টি ছুঁড়ে ফেলার মত আবর্জনা আর কোন্‌টি রেখে দেবার মত মূল্যবান তথ্য এবং পরবর্তীতে তা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। কেউ এটিকে তার মাথার মধ্যে খট্‌ মট্‌ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারে না। এটিকে অবশ্যই উপযুক্ত শ্রেণীতে রাখতে হবে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তথ্যটি এখনো চিন্তাজাগানিয়া হয়, তাহলে একজনকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, এটি সত্যের

জাতীয় নয়। বরং বিজ্ঞানের ভাষার মত পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিভিন্ন তথ্য পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন ঃ "অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করেনা যে, আসমান-যমিন সব মিলিত অবস্থায় ছিল, অতঃপর আমি সেগুলিকে পৃথক করে দিয়েছি আর পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি? তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না?" কুরআনের এই আয়াতে দু'টি বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য পেশ করা হয়েছে। এক. একক জড়পিণ্ড থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, দুই. পানি থেকে জীবনের সৃষ্টি। এই বক্তব্যের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা আছে কি? —অনুবাদক।

নিকটবর্তী না মিথ্যার নিকটবর্তী। কিন্তু সমস্ত তথ্য যদি পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে একজনকে এই দুই বিকল্পের মধ্যে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে । আর তথ্যগুলি সঠিক কিনা সে ব্যাপারে কেউ যদি ইতিবাচক ধারণা না পায়, তাহলেও তার কাছে দাবী ওঠে যে, সে সমস্ত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করবে এবং এই স্বীকৃতি দেবে যে, সে নিশ্চিতভাবে জানে না। যদিও এই শেষের পয়েন্টটি নিরর্থক মনে হচ্ছে, তবুও পরবর্তীতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে। সহায়ক হবে এই ভাবে যে, এটি সেই ব্যক্তিকে ঘটনাগুলির স্বীকৃতি দিতে, গবেষণা করতে এবং পুনর্মূল্যায়ণ করতে তাকিদ দেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, কেউ ঘটনাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং নিরুৎসুকভাবে বা সহমর্মিতার কারণে বর্জন করে না।

কুরআনের সত্যতার প্রকৃত নিশ্চয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এটির মধ্যে প্রচলিত আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। এই আত্মবিশ্বাস যে ভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে তা হল "বিকল্পগুলির নিঃশেষকরণ"। সারকথা, কুরআন ইরশাদ করে, "এই গ্রন্থটি অবতীর্ণ বাণী; যদি আপনি এটি বিশ্বাস না করেন, তাহলে বলুন এটি কী?" অন্য কথায়, পাঠককে চ্যালেঞ্জ করা হয় অন্য কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে। এখানে একটি বই যা কাগজ-কালিতে তৈরি। এটি কোথা থেকে এল? এটি বলছে যে, এটি ঐশী প্রত্যাদেশ; যদি এটি তা না হয়, তাহলে এর উৎস কী? মজার ঘটনা হল, কেউ-ই কাজের কাজ হয় এমন ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। আসলে, সব বিকল্প শেষ হয়ে গেছে। অমুসলিমদের দ্বারা যেমনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই বিকল্পগুলি মূলতঃ কমে এসে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদে এসে ঠেকেছে। তারা একটি বা অপরটির উপর জিদ ধরে বসে থাকে। একদিকে বিরাট একদল লোক যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুরআন গবেষণা করছেন এবং যারা দাবী করেন, "একটি জিনিস আমরা নিশ্চিতভাবে জানি— ঐ ব্যক্তি, মুহাম্মাদ (সা), ভাবতেন যে তিনি নবী ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন উন্মাদ!"[9] তারা নিশ্চিত যে,

---

9. এটি কোন নতুন কথা নয়। মহানবীর (সা) নবুয়াত লাভের পর তাঁর সাথে যে ঘোরতর শত্রুতা শুরু করেছিল তাঁর দেশবাসী, এটি তারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। কুরাইশদের বিশ্বাস ছিল, কেউ রাসূলের (সা) সংস্পর্শে গেলে তাঁর দীন কবুল করে নেবে। তাই তারা বহিরাগত হজ্বযাত্রীদেরকে মুহাম্মাদ (সা)-এর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁর উপর অনেক মিথ্যা আরোপ করত।

কোনভাবে মুহাম্মাদ (সা)-কে বোকা বানানো হয়েছিল। অপরপক্ষে, আরেকটি দল আছে যারা অভিযোগ করে, "এই প্রমাণের কারণে একটি বিষয় আমরা নিশ্চিতভাবে জানি তা হল, ঐ ব্যক্তি, মুহাম্মাদ, মিথ্যুক ছিলেন।" পরিহাসের ব্যাপার হল, মতভেদ ছাড়া এই দুই দল কখনো একত্র হয় না। আসলে, ইসলামের উপর অনেক তথ্যপঞ্জী সচরাচর উভয় তত্ত্বই দাবী করে। তারা চেঁচিয়ে ওঠে একথা বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) উন্মাদ ছিলেন এবং তারা কথা শেষ করে এই বলে যে, তিনি মিথ্যুক ছিলেন। তারা কখনোই উপলব্ধি করে বলে মনে হয় না যে, তাঁর পক্ষে উভয়টি হওয়া সম্ভব ছিল না।[10]

তাঁর বিরুদ্ধে কোন্ কথা বলা যায় তা তারা সভা ডেকে স্থির করত যেন তারা বহিরাগতদের কাছে বিভিন্ন রকম কথা বলে নিজেরাই ফেঁসে না যায়। এরকম এক সভায় ওলীদ বিন মুগীরাকে লোকেরা প্রস্তাব দিয়েছিল, 'তাঁকে পাগল বলা যেতে পারে।' জবাবে ওলীদ বলেছিল, 'সে পাগল নয়। পাগলামি আমরা দেখেছি এবং তা চিনি। পাগলের মত শ্বাসবদ্ধতা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, মানসিক অস্থিরতা এবং বিভ্রান্তি — এরকম কিছু তো মুহাম্মাদের ভেতর নেই।' আরেক দিনের সভায় নযর ইবনুল হারিস কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'ওহে কুরাইশ, তোমাদের উপর এক মহা আপদ নেমে এসেছে। তোমরা একে প্রতিরোধ করার কোন কার্যকর কৌশল এখনো খুঁজে পাওনি। তোমরা তাকে পাগল বলছ। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। পাগলের হাব-ভাব, চাল-চলন কি রকম হয় তা আমরা জানি।' এসব বিবরণ থেকে যা পরিষ্কার হয়ে যায় তা হল, ইসলামের সূচনাপর্বে অবিশ্বাসীরা মহানবী (সা) সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলত, যা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করত না। —অনুবাদক।

10. যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যাচার করে, সে উন্মাদ হতে পারে না। আবার যে উন্মাদ, সে ভেবে-চিন্তে কথা বলে না; সে প্রলাপ বকে। তার কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে যাওয়াটা আরেক পাগলামী। তাছাড়া, মহানবী (সা)-এর সত্যবাদিতা ও সততা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি এতটাই সুবিদিত ছিল যে, দেশবাসী তাঁকে 'আল আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী আখ্যা দিয়েছিল। আবু জাহলের মত মহানবীর ঘোরশত্রুও তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করত না। বদর যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শুরাইক নিরিবিলিতে আবু জাহলকে জিজ্ঞাসা করে, 'এখানে তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। সত্যি করে বলো তো, মুহাম্মাদকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না মিথ্যাবাদী?' আবু জাহল জবাব দেয়, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সত্যবাদী। সারা জীবন কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, আল্লাহর ঘরের পাহারাদারী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আর নবুয়াত সবকিছুই কুসাই বংশের লোকদের ভাগে পড়ল, তখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখার ভাগে কি থাকে বলো?'

মহানবীর প্রতি মক্কাবাসীর আস্থা এতটা বেশি ছিল যে, তাঁকে হত্যা করার জন্য যে রাতে তারা তাঁর বাড়ি অবরোধ করে, সেরাতেও তাদের অনেকের অর্থ-সম্পদ মহানবী (সা)-এর কাছে আমানত ছিল। তিনিও কী অনুপম আমানতদারীর পরিচয়ই না দিয়েছিলেন! যে কোন মুহূর্তে শত্রুর তলোয়ার মরণ আঘাত হানতে পারে, অথচ তিনি তাদেরই গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন হযরত আলী (রা) কে! মহানবীর এই তুলনাবিহীন বৈশিষ্ট্যের কথা মণীষী টমাস কার্লাইল তাঁর Heroes and Hero-worship গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস করেন যে তিনি নবী, তাহলে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে থেকে পরিকল্পনা করবেন না, "আমি কিভাবে আগামীকাল লোকদের বোকা বানাবো যেন তারা ভাবে যে আমি নবী।" তিনি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করেন যে, তিনি নবী আর তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর উত্তর তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হবে। আসলে কুরআনের বিরাট অংশ প্রশ্নের উত্তর আকারে এসেছে। কেউ একজন মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রশ্ন করত আর ওহী আসত তার উত্তরসহ। যদি কেউ উন্মাদ হয় এবং বিশ্বাস করে যে, একজন ফেরেশতা তার কানে কানে কথা বলেন, তাহলে কেউ যখন তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তখন সে মনে করবে যে, ফেরেশতা তাকে উত্তর যুগাবে। যেহেতু সে উন্মাদ, সেহেতু আসলেই সে তা মনে করে। সে কাউকে বলে না অল্প সময় অপেক্ষা করতে আর তারপর বন্ধুদের কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কেউ কি উত্তরটি জানো?" এহেন আচরণ হল তেমন লোকের বৈশিষ্ট্য যে বিশ্বাস করে না যে, সে নবী। অমুসলিমরা যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তা হল, দুই পথেই আপনি এটি পেতে পারেন না। কেউ ভ্রান্ত বিশ্বাস লালন করতে পারে অথবা সে মিথ্যাবাদী হতে পারে। সে হয় দু'টির মধ্যে একটি হবে অথবা কোনটিই হবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সে উভয়টি হতে পারে না! গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এগুলি পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

অমুসলিমরা অনবরত যে বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে নিচের পরিস্থিতি তার একটি ভাল উদাহরণ। যদি আপনি তাদের কাউকে প্রশ্ন করেন, 'কুরআনের উৎস কী?' সে উত্তর দেয় যে, এটি এমন এক ব্যক্তির মন থেকে উদ্ভূত যিনি ছিলেন উন্মাদ। তারপর আপনি তাকে প্রশ্ন করেন, 'যদি এটি তাঁর মাথা থেকে আসে, তাহলে তিনি এর মধ্যকার তথ্যগুলি কোথায় পেলেন? নিঃসন্দেহে কুরআন এমন অনেক জিনিসের উল্লেখ করে যার সাথে আরবরা পরিচিত ছিল না।' ফলে আপনি তার কাছে যে ঘটনা নিয়ে এলেন তার ব্যাখ্যা দেবার জন্য তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করেন আর বলেন, "বেশতো, তিনি হয়ত উন্মাদ ছিলেন না। হয়ত কোন বিদেশী তাঁকে

'মুহাম্মাদ সত্য ও বিশ্বস্ততার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা করতেন, যা বলতেন এবং যা ভাবতেন — সে-সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সৎ।' — অনুবাদক।

তথ্যগুলি এনে দিয়েছিল। তাই তিনি লোকদের মিথ্যা বলেছিলেন যে, তিনি নবী।" এই পর্যায়ে আপনার তাকে প্রশ্ন করতে হবে, "যদি মুহাম্মাদ (সা) মিথ্যুক হতেন তাহলে আত্মবিশ্বাস কোথায় পেতেন? কেন তিনি এমন আচরণ করতেন যেন আসলেই তিনি নিজেকে নবী ভাবতেন?" অবশেষে বিড়ালের মত কোণ্ ঠাসা হয়ে প্রথম জবাবকে আঁকড়ে ধরে আক্রমণ করে বসেন। তিনি দাবী করেন, 'বেশ, হয়ত তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি সম্ভবতঃ উম্মাদ ছিলেন আর সত্যিকারভাবেই ভাবতেন যে, তিনি নবী।' ভদ্রলোক একথা ভুলে যান যে, ইতোমধ্যে সে সম্ভাবনা তিনি শেষ করে দিয়েছেন। আর এভাবে তিনি নিরর্থক বৃত্ত পুনরায় শুরু করেন।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনে এমন অনেক তথ্য আছে যার উৎস আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভাবা যেতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মুহাম্মাদ (সা)-কে জুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কে কে বলেছিল? এ স্থানটি তো উত্তরে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত।[11] কে তাঁকে বলেছিল ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে? কেউ এই ঘটনাগুলির মত ঘটনাবলী একত্র করার পর যদি এগুলির অস্তিত্বের উৎস হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই অনুমান অবলম্বন করে যে, কেউ মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে তথ্যগুলি নিয়ে এসেছিল আর তিনি এসব ব্যবহার করেছিলেন লোকদের বোকা বানানোর জন্য। যাহোক, এই তত্ত্ব সহজেই ভুল প্রমাণ করা যায় একটি সহজ প্রশ্নের সাহায্যেঃ 'যদি মুহাম্মাদ (সা)

---

11. জুলকারনাইনের প্রাচীর ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বের আরো অনেক কথাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ফিরাউনের কথা বলা যায়। যে ফিরাউন মুসা (আ) ও তাঁর জাতির সাথে শত্রুতা পোষণ করত, তার কথা বাইবেলের পুরাতন নিয়মেও (The Old Testament) উল্লেখ আছে। তাই অনেক অবিশ্বাস প্রবণ লোক বলে থাকেন, এসব তো নতুন কথা নয়। কিন্তু তাঁরা এখানে যে বড় ভুল করেন তা হল, কুরআন ফিরাউনের ঘটনার সাথে এমন একটি তথ্য সংযোজন করেছে, যার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক কালে। কুরআন ঘোষণা করছে, "আমি কেবল তোমার মৃতদেহকেই রক্ষা করব, যাতে তুমি তাদের জন্য নিদর্শন হতে পারো যারা তোমার পরে আসবে।" ফিরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষণের এই ঘোষণা কিন্তু বাইবেলে নেই। এ-সম্পর্কে ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর বেস্ট সেলার The Bible, the Quran and Science গ্রন্থে বলেন, "এই ফেরাউন মারনেপ্তাহ্‌র মমিকৃত দেহটি আবিষ্কার করেন মিঃ লরেট ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা থেকে। সেখান থেকে মমিটিকে কায়রো নিয়ে আসা হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই এলিয়ট স্মিথ এই মমিটির আবরণ উম্মোচণ করেন। . . . সেই থেকে কায়রোর যাদুঘরে পর্যটকদের দর্শনের জন্য মটিটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে– মাথা ও ঘাড়টি খোলা– বাদবাকী দেহটা কাপড়ে ঢাকা।"

মিথ্যাবাদী হতেন, তাহলে তিনি বিশ্বাসের দৃঢ়তা কোথায় পেয়েছিলেন? কেন তিনি কিছু লোকের মুখের উপর এমন কথা বলে দিতেন যা অন্যেরা কখনোই বলতে পারত না?' এই ধরণের আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ নির্ভর করে এটা নিশ্চিত হবার উপর যে, তাঁর কাছে সত্যিকার প্রত্যাদেশ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আবু লাহাব নামে নবীজির এক চাচা ছিল। এই লোকটি ইসলামকে এতই ঘৃণা করত যে, সে মহানবীকে (সা) অনুসরণ করে বেড়াতো তাঁকে অপদস্থ করার জন্য। যদি আবু লাহাব নবীজিকে কোন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলতে শুনত, তাহলে সে তাদের পৃথক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত আর তারপর আগন্তুকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'সে তোমাকে কী বলল? সে কি কালো বলেছে? বেশতো, এটা সাদা। সে কি সকাল বলেছে? আসলে এটাতো রাত।' সে বিশ্বস্ততার সাথে মুহাম্মাদ (সা) ও মুসলিমদের কথার ঠিক বিপরীত কথা বলত।[12] যাহোক, আবু লাহাবের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে তার সম্পর্কে কুরআনের একটি ছোট সূরা অবতীর্ণ হয়। এটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, সে জাহান্নামে যাবে। অন্য কথায়, এটি নিশ্চিত করে যে, সে কখনোই মুসলিম হবে না এবং ফলতঃ চিরতরে সাজাপ্রাপ্ত হবে। দশ বছর সময়কালে আবু লাহাবকে শুধু যা করতে হত তা হল এই বলা, "আমি শুনেছি, মুহাম্মাদের কাছে ওহী এসেছে যে, আমার কখনো পরিবর্তন হবে না, আমি কখনো মুসলিম হব না আর জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করব। বেশতো, আমি এখন মুসলিম হতে চাই। তুমি এটা কীভাবে নেবে? এখন তুমি তোমার ওহী সম্পর্কে কী

---

12. হযরত রবীয়া (রা) বর্ণনা করেন, "আমি তখন ছোট ছিলাম। আমি একদিন পিতার সাথে যুল-মাজায বাজারে গেলাম। আমি নবী করিম (সা)-কে দেখলাম, তিনি এই রূপ কথা বলছেন, 'হে লোকেরা! বল, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।' তাঁর পেছনে পেছনে আরেক ব্যক্তি বলতে থাকে, 'এই লোকটি মিথ্যাবাদী। এই লোক পৈত্রিক ধর্ম থেকে ফিরে গেছে।' আমি (রবীয়া রা.) জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লোকটি কে?' লোকেরা উত্তর দিল, 'এতো তাঁর চাচা আবু লাহাব।' তারিক ইবনে আবদুল্লাহও অনুরূপ একটি বর্ণনা করেন। মহানবী (সা)-এর সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ করত তাঁর এই চাচা। মহানবী (সা) যখন পুত্রশোকে মুহ্যমান, তখন সে উল্লাসে ফেটে পড়ত আর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ছুটে যেত 'সুসংবাদ' দিতে। দীর্ঘ তিন বছর যখন রাসূল (সা) ও তাঁর বংশের লোকদের বয়কট করে রাখা হয়, তখনো আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য। মক্কাবাসীদের উপর তো নিষেধাজ্ঞা ছিলই তাঁদের কাছে খাদ্য বিক্রয় করার, বাইরের কাফিলাকেও সে বাধা দিত তাঁদের কাছে খাদ্য বিক্রি করতে। ফলে শেষ অবধি মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, ঘাস-পাতা খেয়ে তাঁদেরকে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। —অনুবাদক।

ভাববে?" আর ঠিক এই ধরনের আচরণই লোকে তার কাছে আশা করত যেহেতু সে সব সময় ইসলামের বিরোধিতার সুযোগে থাকত। কিন্তু সে কখনো তা করেনি। সারকথা, মুহাম্মাদ (সা) যেন তাকে বলেন, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর আর আমাকে তুমি শেষ করে দিতে চাও? এস, এই কথাগুলি বল, তাহলেই আমি শেষ। এস, বল এই কথা।" কিন্তু আবু লাহাব কখনোই তা বলেনি। দশ বছর! এই সমগ্র সময়কালে সে কখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি, এমনকি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীলও হয়নি। আবু লাহাব কুরআনের ওহীর দাবী পূরণ করবে, এটা কীভাবে মুহাম্মাদ (সা) নিশ্চিতভাবে জানলেন যদি তিনি (মুহাম্মাদ সা) সত্যিই আল্লাহর দূত না হতেন? কীভাবে তিনি এত আত্মবিশ্বাসী হতে পারলেন যে, একজনকে তাঁর নবুওয়তের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ১০ বছর সময় দিলেন? একমাত্র জবাব হল এই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর দূত। কারণ এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার জন্য একজনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে হয় যে, তাঁর কাছে ওহীর জ্ঞান আছে।[13]

মুহাম্মাদ (সা)-এর নিজ নবুওয়াতের প্রতি এবং ফলতঃ তাঁর বাণীর আসমানী সুরক্ষার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের আরেকটি উদাহরণ হল যখন তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় যাবার পথে আবু বকর (রা)-কে নিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। এই দু'জন পরিষ্কার দেখতে পান, লোকজন তাদের

13. এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ শুধু আবু লাহাবের উদ্দেশ্যেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি, তার স্ত্রী উম্মে জামীলকেও একই চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। মহনবীর (সা) এই চাচীও তাঁর প্রতি কম শত্রুতা পোষণ করত না। সে রাসূলের (সা) দুয়ারে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। তাছাড়া চোগলখুরি করেও তাঁকে মানসিকভাবে অনেক কষ্ট দিত। আবু লাহাবের সাথে সাথে তার স্ত্রী সম্পর্কেও কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ "শীঘ্রই সে (আবু লাহাব) প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিশিখায়। আর তার স্ত্রীও— যে ইন্ধন বহন করে" (সূরা লাহাব)। মহানবীর (সা) সাথে চরম শত্রুতা পোষণকারী এই নারীও বহুদিন অবকাশ পেয়েছিল কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার; কিন্তু তা সে করেনি। এভাবে আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেছে , মহানবী (সা) এত নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর জ্ঞান ছিল ওহী-ভিত্তিক। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, ইসলামের প্রতি শত্রুতায় হিন্দা আবু লাহাবের স্ত্রীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে তার লোক দিয়ে মহানবীর (সা) প্রাণপ্রিয় চাচা হামযা (রা)-কে হত্যা করিয়েছিল। তারপর তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল। এই নারী সম্পর্কে কিন্তু কুরআনে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। কলিজা চিবানোর ঘটনার অনেক পরে এই নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। আরো মজার ব্যাপার হল, আবু লাহাব দম্পতির এক মেয়ে দুররা এবং দুই ছেলে উতবা ও মুয়াত্তাব পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেবল কুরআন যাদের জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছিল, তারা আমরণ ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করে এই মহাগ্রন্থের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। —অনুবাদক।

হত্যা করতে আসছে। আবু বকর (রা) ভীত হয়ে পড়েন। কোন সন্দেহ নেই মুহাম্মাদ (সা) মিথ্যুক বা জালিয়াত হলে কিংবা তাঁর নবুওয়াতের উপর লোকদের বোকা বানিয়ে আস্থা অর্জনে প্রয়াসী হলে লোকে আশা করত, এরকম পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলবেন, "ওহে আবু বকর, দেখতো এই গুহা থেকে বেরুবার জন্য পেছন দিকে কোন পথ আছে কিনা।" কিংবা "ঐ কোণে গিয়ে চুপ করে বসে থাকো।" অথচ আবু বকরকে (রা) তিনি যা বলেছিলেন তা তাঁর আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট উদাহরণ, "ভেবনা, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, আর আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন!" এখন যদি কেউ জানেন যে, তিনি লোকদের বোকা বানাচ্ছেন, তাহলে এই ধরণের মনোভাব তিনি কোথায় পান?

আসলে এহেন মনোকাঠামো আদৌ কোন মিথ্যুক বা জালিয়াতের বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব, আগে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, অমুসলিমরা একটি বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে; তারা এটা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। কুরআনে যা তারা পেয়েছে তার প্রকৃত উৎসের (অর্থাৎ আল্লাহর) সাথে এগুলিকে সম্পর্কিত না করে এগুলি ব্যাখ্যা করার কিছু পথ খুঁজছে তারা । এক দিকে তারা আপনাকে সোম, বুধ ও শুক্রবারে বলবে, "লোকটি মিথ্যুক ছিলেন", আর অপরপক্ষে, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে বলবে, "তিনি উন্মাদ ছিলেন।" তারা যা মেনে নিতে আস্বীকার করেন তা হল, কেউ উভয়টিই হতে পারে না। তথাপি কুরআনের তথ্যাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের উভয় অজুহাতই প্রয়োজন।

প্রায় সাত বছর আগে, আমার বাড়িতে এক পাদ্রী এসেছিলেন। যে বিশেষ কামরায় আমরা বসেছিলাম, সেখানে টেবিলের উপর একখানা কুরআন উল্টানো অবস্থায় ছিল। আর তাই পাদ্রী জানলেন না সেটি কোন্ বই। আলোচনার মাঝে আমি কুরআনটি দেখিয়ে বললাম, "ঐ বইয়ের প্রতি আমার আস্থা আছে।' কুরআনের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ওটি কি বই না জেনে, তিনি জবাব দিলেন, "ভাল কথা, আমি বলছি, যদি ঐ বইটি বাইবেল না হয়, তাহলে ওটি কোন মানুষের রচনা!" তাঁর বক্তব্যের জবাবে আমি বললাম, "ঐ বইটিতে কী আছে সে সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু বলছি।" মাত্র তিন-চার মিনিটে আমি তাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত সামান্য কিছু বিষয়

বললাম। মাত্র ঐ তিন-চার মিনিট পরে তিনি তার অবস্থান সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেললেন এবং ঘোষণা করলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কোন মানুষ ঐ বই লেখেনি। শয়তান ওটা লিখেছে।" আসলে এ ধরণের মনোভাব পোষণ করা অনেক কারণে দুর্ভাগ্যজনক একটি বিষয়। এটি খুব দ্রুত ও সস্তা অজুহাত। অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে এটি তাৎক্ষণিক প্রস্থান। বাইবেলে একটি বিখ্যাত গল্প আছে যাতে উল্লেখ আছে কিভাবে একজন ইহুদী এক মৃত ব্যক্তিকে যীশু কর্তৃক জীবিত করা প্রত্যক্ষ করেছিল। লোকটি চার দিন মৃত অবস্থায় ছিল, আর যখন যীশু এসে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি শুধু বললেন, "উঠে পড়ো!" আর লোকটি উঠে চলে গেল। এহেন দৃশ্য দেখে কিন্তু ইহুদী দর্শক অবিশ্বাসভরে বলল, "এতো শয়তান। শয়তান তাকে সাহায্য করল!" এখন এই গল্প সারা পৃথিবীর গীর্যাসমূহে শোনানো হয় আর লোকেরা অনেক অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বলে, "ওহ্ আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে আমি ইহুদীগুলোর মত বোকামী করতাম না!" তথাপি পরিহাসের বিষয় এই লোকেরা ঠিক তাই করে যা ইহুদীরা করেছিল। যখন আপনি মাত্র তিন মিনিটে কুরআনের সামান্য অংশ দেখান আর তারা যা বলতে পারে তা হল, "ওহ্ শয়তান এটি করেছিল। শয়তান ঐ বইটি লিখেছিল!" কারণ তারা সত্যিকার অর্থে কোণঠাসা হয়ে গেছে এবং অন্য কোন চলনসই উত্তর তাদের কাছে নেই, সেহেতু তারা সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে সস্তা অজুহাত অবলম্বন করে। লোকদের এই দুর্বল মতামত ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ দেখা যায় মুহাম্মাদ (সা)-এর বাণীর মক্কাবাসীদের ব্যাখ্যায়। তারা বলত, "শয়তান ঐ বাণী মুহাম্মাদ এর কাছে নিয়ে আসে!" কিন্তু অন্যান্য প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, এক্ষেত্রেও কুরআন এ দাবীর উত্তর দিচ্ছে। একটি আয়াতে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে-

"আর তারা বলে, 'নিশ্চয় সে আছরগ্রস্ত', অথচ এটি (অর্থাৎ কুরআন) জগতসমূহের প্রতি স্মারক ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"

এভাবে কুরআন এই ধরণের তত্ত্বের জবাবে যুক্তি পেশ করছে। শয়তান মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে বাণী নিয়ে আসত— এই প্রস্তাবনার জবাবে অনেক যুক্তি কুরআনে আছে। উদাহরণ স্বরূপ ২৬তম সূরায় আল্লাহ্ পরিষ্কার ঘোষণা করছেন ঃ

"কোন শয়তান এটি (ওহী) অবতীর্ণ করেনি। এটি তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়, না তারা এটি করতে সক্ষম। আসলে তারা শ্রবণ করা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।"

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

"আর যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে, তখন বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

এখন বলুন, এভাবেই কি শয়তান একটি বই লেখে? সে কি কাউকে বলবে, "তুমি আমার বই পড়ার আগে আলস্নাহকে বল আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে?" এটি খুব, খুবই প্রতারণামূলক। বস্তুতঃ একজন মানুষ এরকম কিছু লিখতে পারত, কিন্তু শয়তান কি এটি করত? অনেক লোক স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় যে, তারা এই বিষয়ে উপসংহারে পৌঁছাতে অক্ষম। এক দিকে তারা দাবী করে যে, শয়তান এ রকম কাজ করত না আর যদি সে করতে পারতও, আলস্নাহ তাকে করতে দিতেন না; তথাপি, অপরপক্ষে, তারা বিশ্বাসও করে যে, শয়তান আলস্নাহর চেয়ে শুধু অল্প একটু দুর্বল। সারকথা, তারা অপবাদ দেয় যে, আলস্নাহ যা করতে পারেন, শয়তান সম্ভবত সেই কাজ করতে পারে । এর ফলে যখন তারা কুরআনের দিকে লক্ষ্য দেয়, তখন খুব বিস্মিত হয়; এটি কী বিস্ময়কর! তবু তারা জিদ ধরে, "শয়তান এটি করেছে!" আল্লাহ্কে ধন্যবাদ, মুসলিমদের সেই মনোভাব নেই। যদিও শয়তানের কিছু ক্ষমতা থাকতে পারে, তা আল্লাহর ক্ষমতার তুলনায় কিছুই নয়। আর কোন মুসলিমই মুসলিম হতে পারে না, যদি না সে তা বিশ্বাস করে। এটি এমনকি অমুসলিমদের মধ্যেও সাধারণ জ্ঞান যে, শয়তান সহজেই ভুল করতে পারে। আর এটি প্রত্যাশিত ব্যাপার হত, সে যদি এবং যখন একটি বই লিখত, তখন নিজের সাথে স্ব-বিরোধিতা করত। কারণ, কুরআন বলে-

"তারা কি কুরআনের বিষয় বিবেচনা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তাহলে তারা নিশ্চয় তাতে অনেক স্ববিরোধিতা দেখতে পেত।"

কুরআনের ব্যাখ্যার অতীত আয়াতসমূহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার নিরর্থক প্রয়াস পেতে অমুসলিমরা অজুহাত পেশ করে। তারা প্রায়শঃ

আরেকটি আক্রমণ করে যা দুই মতবাদের সমণ্বয় বলে মনে হয়। তারা দাবী করে যে, মুহাম্মাদ (সা) উন্মাদ ও মিথ্যাবাদী ছিলেন। মূলতঃ এই লোকেরা দাবী করে যে, মুহাম্মাদ (সা) অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন আর ভ্রান্ত ধারণার ফলে তিনি লোকদের কাছে মিথ্যা বলতেন এবং তাদের বিপথে চালিত করতেন। এটি প্রকাশের জন্য মনোবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা আছে। এর উল্লেখ করা হয় মিথোম্যানিয়া বলে। সোজা কথায় এর অর্থ হল, একজন মিথ্যা কথা বলে তারপর তা বিশ্বাস করে। অমুসলিমদের দাবী হল, মুহাম্মাদ (সা) এতে ভুগতেন। কিন্তু এই প্রস্তাবনা নিয়ে যে সমস্যা তা হল, মিথোম্যানিয়ায় ভুগছে এমন কেউ বাস্তবতা নিয়ে মোটেই কাজ করতে পারে না। অথচ সমগ্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই গবেষণা করা যেতে পারে এবং সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যেহেতু একজন মিথোম্যানিয়া রোগীর জন্য বাস্তবতা এরকম সমস্যা, সেহেতু কোন মনোবিজ্ঞানী যখন চেষ্টা করেন ঐ অবস্থার কোন রোগীর চিকিৎসা করতে, তখন তিনি অবিরাম তাকে বাস্তবতার মুখোমুখি করেন। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় এবং দাবী করে,"আমি ইংল্যান্ডের রাজা," তাহলে মনোবিজ্ঞানী তাকে বলবেন না, "না, আপনি রাজা নন; আপনি উন্মাদ!" ঠিক এই কাজটি তিনি করেন না। বরং তিনি তাকে সত্যের মুখোমুখি করেন আর বলেন, "বেশ, আপনি বলছেন আপনি ইংল্যান্ডের রাজা। অতএব আমাকে বলুন রাণী আজ কোথায়? আর আপনার প্রধানমন্ত্রী কই? আর আপনার দেহরক্ষীরা কই?" লোকটি যখন এই প্রশ্নগুলি নিয়ে কাজ করতে সমস্যায় পড়ে, তখন সে একথা বলে অজুহাত দেবার চেষ্টা করে, "উঁম্ .. রাণী ..তিনি মায়ের বাড়ি গেছেন। উঁম্ .. মন্ত্রী .. বেশ, তিনি মারা গেছেন।" আর ঘটনাক্রমে সে আরোগ্য লাভ করে। কারণ সে বাস্তবতা নিয়ে কাজ করতে পারে না। যদি মনোবিজ্ঞানী পর্যাপ্ত বাস্তবতা নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া অব্যাহত রাখেন, তাহলে অবশেষে সে সত্যের মুখোমুখি হয় আর বলে, "আমি অনুমান করছি, আমি ইংল্যান্ডের রাজা নই।" কুরআন প্রত্যেক পাঠকের মুখোমুখি হয় ঠিক সেই ভাবে যেভাবে একজন মনোবিজ্ঞানী তার মিথোম্যানিয়াক রোগীর চিকিৎসা করেন। একটি আয়াত আছে যেখানে কুরআন বলছে ঃ

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে এক সতর্কবাণী এসেছে (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আর আরোগ্য এসেছে যা আছে তোমাদের অন্তরে— আর দিকনির্দেশনা ও করুণা এসেছে বিশ্বাসীদের জন্য।"

প্রথম দৃষ্টিতে এই বক্তব্য অস্পষ্ট মনে হয়, কিন্তু কেউ যখন এটি পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণের আলোকে দেখেন, তখন এই আয়াতের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। মূলতঃ, একজন কুরআন পাঠের মাধ্যমে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আরোগ্য লাভ করে। সারকথা, কুরআন হল থেরাপি। আক্ষরিক অর্থেই এই গ্রন্থটি ভ্রান্ত-বিশ্বাসীদের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আরোগ্য করে। সারা কুরআনে ছড়িয়ে থাকা একটি ভঙ্গী হল এটি যা বলে, "হে মানব, এটি সম্পর্কে তুমি এই এই কথা বল; কিন্তু এমন এমন ব্যাপারগুলি কি? তুমি কিভাবে এমন কথা বলতে পারো যখন তুমি এটা জানো?" ইত্যাদি। কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক আর কোন্‌টি গুরুত্ববহ তা বিবেচনা করার তাকিদ দেয় এই মহাগ্রন্থ; একই সাথে একজনকে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আরোগ্য করে।[14] ঠিক এই ধরণের জিনিস তথা লোকদের বাস্তবতার মুখোমুখি করার ব্যাপারটি অনেক অমুসলিমের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। আসলে, নিউ ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়ায় এই সম্পর্কিত খুব মজার একটি কথা উল্লেখ আছে।

কুরআন বিষয়ক একটি নিবন্ধে, ক্যাথলিক চার্চ বলছে, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুরআনের উৎস বিষয়ে অনেক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে ... আজ কোন যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ এসব তত্ত্বের কোন একটি কেউ গ্রহণ করে না।" এটি হল সুপ্রাচীন ক্যাথলিক চার্চ যা অনেক শতাব্দী ধরে আশে পাশেই আছে আর কুরআনকে ব্যাখ্যা করার এসব নিরর্থক প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করছে। আসলে কুরআন হল ক্যাথলিক চার্চের জন্য এক সমস্যা। গ্রন্থটি বিবৃত করে যে, এটি অবতীর্ণ, কাজেই তারা এটি পাঠ করে। নিশ্চয়ই তারা প্রমাণ খুঁজে পেতে পছন্দ করে যে, এটি তা নয় (অর্থাৎ অবতীর্ণ নয়),

---

14. ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আরোগ্য করার অসংখ্য নজির ছড়িয়ে আসে কুরআনে। মাত্র একটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হল ঃ "শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা, যাদেরকে তারা শরিক সাব্যস্ত করে? বলোতো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল? আকাশ থেকে কে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? . . . অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কি?" (সূরা আন্‌ নামল, আয়াত-৫৯)

কিন্তু তারা তা পারে না। তারা একটি যুৎসই ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। কিন্তু তারা অন্ততঃ তাদের গবেষণায় সৎ এবং প্রথম থেকে যে অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা চলে আসছে তারা তা গ্রহণ করে না। চার্চ বিবৃত করে যে, চৌদ্দশ' বছরে এটির এখনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়নি। অন্ততঃ এটি স্বীকার করে যে, কুরআন এমন কোন সহজ বিষয় নয় যা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে অন্য লোকেরা অনেক কম সৎ। তারা দ্রুত বলে, "ওহ্, কুরআন এখান থেকে এসেছে। কুরআন সেখান থেকে এসেছে।" আর তারা এমনকি অধিকাংশ সময় তাদের বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করে না। ক্যাথলিক চার্চের এহেন বিবৃতি অবশ্য সাধারণ খৃস্টানদের কিছু সমস্যায় ফেলে দেয়। হতে পারে, কুরআনের উৎস সম্পর্কে তার নিজের ধারণা আছে। কিন্তু চার্চের একক সদস্য হিসেবে সে আসলে তার নিজের তত্ত্বের উপর কাজ করতে পারে না। এ ধরণের একটি কাজ হবে চার্চের দাবীর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পরিপন্থী। তার সদস্য হবার কারণে তাকে ক্যাথলিক চার্চের ঘোষণা অবশ্যই বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে এবং তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতএব সারকথা হল, যদি ক্যাথলিক চার্চ সামগ্রিকভাবে বলে, "কুরআন সম্পর্কে এসব অনিশ্চিত রিপোর্টে কান দিও না, তাহলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? এমনকি অমুসলিমরাও স্বীকার করছেন যে, কুরআনে এমন কিছু আছে, এমন কিছু— যার স্বীকৃতি দিতেই হবে, তাহলে মুসলিমরা যখন একই তত্ত্ব নিয়ে আসে তখন লোকে কেন এত একগুঁয়ে, আত্মরক্ষামূলক আর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে? নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি চিন্তাশীল মনের অধিকারীদের জন্য এমন একটি বিষয় যা বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বিবেচনায় আনে!"

সম্প্রতি হ্যান্‌স নামের এক ব্যক্তি যিনি ক্যাথলিক চার্চের প্রথম সারির চিন্তাবিদ তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর মতামত দেন। এই ব্যক্তি কিছুকাল নাগালের মধ্যেই আছেন এবং তিনি ক্যাথলিক চার্চে খুব সম্মানিত। সতর্কতার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার পর তিনি যা পেয়েছেন তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, "আলস্নাহ মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন মুহাম্মাদ (সা) নামক মানুষটির

মাধ্যমে।” এটি একটি উপসংহার যাতে উপনীত হয়েছেন একজন অমুসলিম— স্বয়ং ক্যথলিক চার্চের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী! আমি মনে করি না যে, পোপ তাঁর সাথে একমত। তথাপি মুসলিমদের অবস্থানের সমর্থনে এরকম উল্লেখযোগ্য, বিখ্যাত জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মতামত অবশ্যই গুরুত্ব বহন করে । তাঁকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হবার জন্য যে, কুরআন এমন কিছু নয় যা সহজেই একপাশে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। তিনি এই বাস্তবতারও মুখোমুখি হয়েছেন যে, আসলে আল্লাহই এসব বাণীর উৎস। পূর্বে উল্লেখিত তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন বিরোধিতার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাজেই কুরআনকে বাতিল করার অন্য কোন উপায় খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ গ্রন্থটি যদি অবতীর্ণ না হয়, তাহলে এটি প্রতারণা; আর এটি যদি প্রতারণা হয়, তাহলে একজন অবশ্যই প্রশ্ন করবে, “এর উৎস কী? আর এটি কোথায় আমাদের প্রতারিত করছে?” আসলে, এসব প্রশ্নের সত্যিকার উত্তর কুরআনের বিশুদ্ধতার উপর আলোকপাত করে এবং অবিশ্বাসীদের তিক্ত অসত্য দাবীকে স্তব্ধ করে দেয়। তবুও যদি লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে চায় যে, কুরআন একটি প্রতারণা, তাহলে তাদের অবশ্যই এহেন দাবীর সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। প্রমাণের দায় তাদের উপর, আমাদের উপর নয়! একজন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া তত্ত্ব নিয়ে আসবে— এটি কখনোই আশা করা যায় না : কাজেই তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি, “আমাকে একটি প্রতারণা দেখান! আমাকে দেখান কোথায় কুরআন আমাকে প্রতারিত করছে! আমাকে দেখান, অন্যথায় বলবেন না যে, এটি প্রতারণা!”

কুরআনের এক মজার বৈশিষ্ট্য হল এটি বিস্ময়কর বাস্তবতা নিয়ে কাজ করে যা শুধু অতীতের সাথে সম্পর্কিত নয়, আধুনিক কালের সাথেও। সারকথা, কুরআন কোন পুরাতন ‘সমস্যা’ নয়। এমনকি আজো এটি এক ‘সমস্যা’— একটি সমস্যা অমুসলিমদের কাছে। কারণ প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক সপ্তাহ, প্রত্যেক বছর অধিক থেকে অধিকতর হারে প্রমাণ হাজির করছে যে, কুরআন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করার মত এক শক্তি । এ প্রমাণও হাজির করছে যে, এটির বিশুদ্ধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না! উদাহরণ স্বরূপ, কুরআনের একটি আয়াত পড়তে এরকম ঃ

"অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করেনা যে আসমান-যমিন সব মিলিত অবস্থায় ছিল, অতঃপর আমি সেগুলিকে পৃথক করে দিয়েছি আর পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি? তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না?"

পরিহাসের বিষয়, এটি ঠিক সেই তথ্য যার জন্য তারা ১৯৭৩ সালে দু'জন অবিশ্বাসীকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। কুরআন এই মহাবিশ্বের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করছে— কিভাবে এটি একক খন্ড থেকে শুরু হয়েছিল— আর মানুষ এমনকি এখন পর্যন্তও এই ওহীর সত্যতা যাচাই করে চলেছে। তাছাড়া, সমস্ত প্রাণের উৎপত্তি যে পানি থেকে এই তথ্য চৌদ্দশ' বছর আগের লোককে নিশ্চিত করা সোজা কথা ছিল না। বস্তুত, ১৪০০ বছর আগে আপনি যদি মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে (নিজের দিকে আঙুল নির্দেশ করে) কাউকে বলতেন, "এই সবকিছু প্রধানতঃ পানি দিয়ে তৈরি", তাহলে কেউ-ই আপনাকে বিশ্বাস করত না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেটার প্রমাণ পাওয়া যেত না। তাদেরকে কোষের মূল উপাদান সাইটোপ্লাজম (যা ৮০% পানি দ্বারা গঠিত) আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তথাপি, প্রমাণ মিলল এবং আরেকবারের মত কুরআন সময়ের পরীক্ষায় টিকে গেল। এটি লক্ষ্য করা মজার ব্যাপার যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষা অতীত এবং বর্তমান উভয়কেই সম্পর্কযুক্ত করে। এগুলির কিছু কিছু ব্যবহৃত হত আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের নমুনা হিসাবে, অপরপক্ষে অন্যগুলি আজকের দিনের জন্যও চ্যালেঞ্জ হিসাবে টিকে আছে। আগেরগুলির একটি উদাহরণ হল কুরআনে আবু লাহাব সম্পর্কে দেওয়া বক্তব্য। এটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে যে, অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ জানতেন, আবু লাহাব কখনোই তাঁর বাণীকে চ্যালেঞ্জ করবে না এবং ইসলাম গ্রহণ করবে না। এভাবে আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন যে, সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। এহেন একটি সূরা ছিল আল্লাহর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এবং তাদের জন্য সতর্কবাণী যারা ছিল আবু লাহাবের মত।

কুরআনে উল্লেখিত পরবর্তী প্রকারের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষার একটি মজার উদাহরণ হল সেই আয়াত যা মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ করেছে। এই আয়াতটি ব্যাপক। এটির আওতা উভয় ধর্মের কোন

ব্যক্তি বিশেষের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সামগ্রিকভাবে দুই দল লোকের মধ্যকার সম্পর্কের সারকথা ব্যক্ত করে। কুরআন উল্লেখ করে যে, ইহুদীরা মুসলিমদের সাথে যেরূপ আচরণ করবে, খৃস্টানরা সব সময় মুসলিমদের সাথে তার চেয়ে ভাল আচরণ করবে।[15] বস্তুতঃ, এহেন বক্তব্যের পূর্ণ প্রভাব অনুভব করা যেতে পারে শুধু এহেন আয়াতের প্রকৃত অর্থের সতর্ক বিবেচনার পর। একথা সত্য যে, অনেক খৃস্টান এবং অনেক ইহুদী মুসলিম হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইহুদী সম্প্রদায়কে ইসলামের চরম শত্রু হিসাবে দেখা হয়। উপরন্তু খুব কম লোক উপলব্ধি করে, কুরআনের এরকম উন্মুক্ত ঘোষণা কিসের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সারকথা, এটি ইহুদীদের জন্য এক সহজ সুযোগ দিয়ে রেখেছে একথা প্রমাণ করার জন্য যে, কুরআন মিথ্যা; এটি অবতীর্ণ বাণী নয়। তাদেরকে যা করতে হবে তা হল, নিজেদের সংগঠিত করা, সামান্য কয়েক বছর মুসলিমদের সাথে চমৎকার ব্যবহার করা, তারপর বলা, "এখন? পৃথিবীতে তোমাদের ভাল বন্ধু কারা— ইহুদীরা নাকি খৃস্টানরা? এ সম্পর্কে তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ কী বলে? দেখ আমরা ইহুদীরা তোমাদের জন্য কী করেছি!" কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা যা করতে পারে তা হল এই! তথাপি তারা ১৪০০ বছরে এটি করেনি। কিন্তু সব সময়ের মত এই প্রস্তাব এখনো উন্মুক্ত রয়েছে!

এযাবৎ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সেইসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা থেকে একজন কুরআনের মুখোমুখি হতে পারে; এগুলি নিঃসন্দেহে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রকৃতির। যাহোক, আরেকটি দিকেরও অস্তিত্ব আছে, তা হল বস্তুনিষ্ঠ এবং তার ভিত্তি হল গাণিতিক। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, যখন কেউ সঠিক অনুমান সমূহের তালিকা প্রস্তুত করে তখন দেখা যায় কুরআন কতই-না বিশুদ্ধ। গাণিতিকভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টান্ত সমূহের সাহায্যে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কারো সামনে বাছাইয়ের জন্য দুইটি বিষয় থাকে (যার একটি সঠিক, অপরটি বেঠিক), আর সে চোখ বন্ধ করে বাছাই করল, তাহলে অর্ধেকবার (অর্থাৎ দুই বারে একবার) সে

---

15. 'আপনি সকল মানুষের মধ্যে মুমিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন ইহুদী ও মুশরিকদের। আর মানুষের মধ্যে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী পাবেন তাদের যারা বলেঃ "আমরা তো নাসারা"।' (সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৮২)

সঠিক হবে। মূলতঃ তার সম্ভাবনা হল দুই এর মধ্যে এক, কারণ সে ভুলটি বেছে নিতে পারে, কিংবা সে সঠিক নির্বাচন করতে পারে। এখন যদি একই ব্যক্তির ঐ রকম দুইটি অবস্থা থাকে (অর্থাৎ এক নম্বর ক্ষেত্রে সে সঠিক বা বেঠিক হতে পারে, এবং দুই নম্বর ক্ষেত্রে সে সঠিক বা বেঠিক হতে পারে) আর সে চোখ বন্ধ করে অনুমান করে, তাহলে সে কেবল সঠিক হবে এক চতুর্থাংশ বার (অর্থাৎ চার বারে এক বার)। এখন তার জন্য আছে চারটি চান্সের মধ্যে একটি; কারণ এখন তার ভুল করার তিনটি পথ আছে আর সঠিক হবার জন্য মাত্র একটি পথ আছে। সোজা কথায়, সে ভুল পছন্দ করতে পারে ১নং ক্ষেত্রে আর তারপর ২নং ক্ষেত্রেও ভুল পছন্দ করতে পারে; কিংবা সে এক নম্বর ক্ষেত্রে ভুলটি বেছে নিতে পারে তারপর দুই নম্বর ক্ষেত্রে সঠিক পছন্দ করতে পারে; অথবা সে এক নম্বর এ সঠিকটি পেয়ে যেতে পারে এবং দুই নম্বর এ ভুল পছন্দ করতে পারে; কিংবা সে এক নম্বর এ সঠিক বাছাই করতে পারে আর তারপর দুই নম্বর ক্ষেত্রেও সঠিক নির্বাচন করতে পারে। অবশ্যই, একমাত্র উদাহরণ যেখানে সে সম্পূর্ণ সঠিক হতে পারে, তা হল শেষ দৃশ্যকল্প; এক্ষেত্রে সে উভয় ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পারে। তার সম্পূর্ণ নির্ভুল অনুমান করার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কমে যায় কারণ তার অনুমানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং এ-ধরনের দৃশ্যকল্পের প্রতিনিধিত্বকারী গাণিতিক সমীকরণ হলঃ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে দুই বারে একবার গুনণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই বারে এক বার)।

উদাহরণটি চলমান থাকলে, যদি একই ব্যক্তির এখন তিনটি পরিস্থিতি থাকে যাতে তাকে অন্ধের মত অনুমান করতে হয়, তাহলে সে সঠিক হবে আট বারে এক বার (অর্থাৎ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$)। পুনশ্চঃ তার সঠিক পছন্দের সম্ভাবনা এই তিন পরিস্থিতিতে কমে গিয়ে সম্পূর্ণ সঠিক হওয়াটা হবে আট বারে এক বার। এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যেহেতু পরিস্থিতির সংখ্যা বাড়বে, সেহেতু সঠিক হবার সম্ভাবনা কমবে, কারণ দুইটি ব্যাপার ব্যাস্তানুপাতিক (বিপরীত আনুপাতিক)।

এখন কুরআনের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এই উদাহরণ প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কেউ কুরআনের নির্ভুল তথ্য সম্বলিত সব কয়টি বাণীর একটি তালিকা তৈরি

করে, তাহলে এটি খুবই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেগুলির সব ক'টি নিছক সঠিক অন্ধ অনুমান হওয়াটা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়বে। বস্তুত কুরআনে আলোচিত বিষয় অসংখ্য, আর এভাবে কারো সেগুলির সব ক'টি সম্পর্কে শুধুমাত্র সৌভাগ্যজনক অনুমানের সম্ভাবনা হয়ে যায় বলতে গেলে শূন্য। কুরআনের ভুল করার লাখো ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিবার এটি সঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, কেউ একজন এসব অনুমান করেছিলেন। কুরআন সঠিক বক্তব্য দিয়েছে এমন বিষয়ের নিম্ন লিখিত তিনটি উদাহরণ একত্রিতভাবে ব্যাখ্যা করে কিভাবে কুরআন অসম্ভাব্যতাকে প্রতিহত করে চলেছে।

১৬তম সূরায় কুরআন উল্লেখ করে যে, স্ত্রী মৌমাছি খাদ্যের সন্ধানে বাসা ছাড়ে।[16] এখন, কোন ব্যক্তি ওটার উপর অনুমান করতে পারে, এ কথা বলে, "যে মৌমাছি তুমি উড়ে বেড়াতে দেখ— এটি পুরুষ হতে পারে, কিংবা এটি স্ত্রী হতে পারে। আমার অনুমান এটি স্ত্রী মৌমাছি।" নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তার সঠিক হবার চান্স দুইটিতে একটি। বাস্তবতা হল এই যে, কুরআনের বক্তব্য সঠিক। কিন্তু এটিও বাস্তবতা যে, কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় সে সময় অধিকাংশ লোক এটি বিশ্বাস করত না। আপনি কি একটি পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারেন? ভালকথা, এ কাজটি করতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। কিন্তু এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, পুরুষ মৌমাছি খাদ্যের সন্ধানে কখনোই বাসা ছাড়ে না। যাহোক, শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক চতুর্থ হেনরিতে কিছু চরিত্র মৌমাছি নিয়ে আলোচনা করে এবং উল্লেখ করে যে, মৌমাছিরা হল সৈনিক আর তাদের একজন রাজা থাকে।[17] ওটাই শেক্‌স্‌পিয়ারের সময়কালের লোকেরা ভাবত— কেউ

---

16. "আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। তারপর চোষণ করে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে।" (সূরা আন্ নাহল, আয়াত ৬৮-৬৯)। বাংলা অনুবাদ থেকে বুঝার উপায় নেই এখানে উল্লেখিত মৌমাছি পুরুষ না স্ত্রী। কারণ, বাংলায় ক্রিয়ার লিঙ্গান্তর হয় না। কিন্তু আরবী ক্রিয়া পুরুষ-বাচক বা স্ত্রী-বাচক হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মৌমাছিকে নির্দেশ দিতে যে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'ইত্তাখিজি'; এটি স্ত্রী-বাচক। অতএব যে মৌমাছিকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন তা স্ত্রী মৌমাছি। পুরুষ মৌমাছি হলে এখানে 'ইত্তাখিজ' ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হত।
—অনুবাদক।

17. ইংরেজি সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট হলেন উইলিয়াম শেক্‌স্‌পিয়ার। বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর অবস্থান রাজকীয় মহিমামণ্ডিত। শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, দার্শনিকসুলভ গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য

চারপাশে যে সব মৌমাছি উড়তে দেখে তারা পুরুষ মৌমাছি আর তারা বাসায় ফিরে গিয়ে রাজার কাছে জবাবদিহি করে। যাহোক, ওটি আদৌ সত্য নয়। সত্যটি হল এই যে, তারা স্ত্রী মৌমাছি এবং এক রাণীর কাছে জবাবদিহি করে। গত ৩০০ বছরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তদন্তে আবিষ্কার করা হয়েছে যে, এটিই বাস্তবতা।[18]

অতএব, সঠিক অনুমানের তালিকার কাছে ফিরে আসুন। মৌমাছি সম্পর্কে কুরআনের সঠিক হবার চান্স ছিল ৫০/৫০ অর্থাৎ দুই এ এক।

মৌমাছির বিষয় ছাড়াও কুরআন সূর্যের আলোচনাও করে আর যেভাবে এটি মহাশূণ্যে পরিভ্রমণ করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করে। পুনশ্চ, কোন ব্যক্তি ঐ বিষয়টি নিয়ে অনুমান করতে পারে। যখন সূর্য মহাশূণ্যে পরিভ্রমণ করে, তখন দুইটি বিকল্প থাকে ঃ এটি সেভাবে পরিভ্রমণ করতে পারে যেভাবে একটি পাথরকে কেউ ছুঁড়ে দিলে তা ছুটত, অথবা এটি আপন ইচ্ছায় চলতে পারে। কুরআন পরবর্তীটা উল্লেখ করেছে— বলেছে যে, এটি আপন গতির ফলে চলে। মহাশূণ্যে সূর্যের গতি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন 'সাবাহা'

তিনি তাবৎ বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তাঁর অসংখ্য কথা প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। গুণীজন বিভিন্ন প্রসংঙ্গে তাঁর বাণী উদ্ধৃত করে থাকেন। এই মনোযোগ পাবার পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মানুষ। দশটি সঠিক কথার পাশাপাশি দুটি বেঠিক কথা তিনি বলতেই পারেন। প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক এই তথ্যটির ক্ষেত্রে তাঁর ভুল করাটা অস্বাভাবিক নয়। শুধু শেকস্পিয়ার নয়, যে কোন দার্শনিক-চিন্তাবিদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মণীষী ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন, "সন্দেহ নেই যে, প্রাচীনকালের বহু চিন্তাবিদ মণীষীই তাঁদের প্রতিভার দ্বারা সঠিক ধরণের কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন; কিন্তু তার পাশাপাশি বিরাট ধরণের গুরুতর সব বিভ্রান্তিকেও তাঁরা আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। . . .মোটকথা, প্রাচীনকালের মণীষীদের চিন্তাধারায় এই ধরণের সঠিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্যের সংমিশ্রণ যেমন লক্ষণীয়; তেমনি কোরআনে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যাবতীয় সঠিক তথ্যের নির্ভুল সমাবেশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । শুধু তাই নয়, অতীত যুগের মণীষীদের পরিবেশিত ওই ধরণের উল্টা-পাল্টা তথ্যের সাথে কোরআনে বর্ণিত আগাগোড়া নির্ভুল ও সঠিক তথ্যাবলীর এই যে পার্থক্য, —তা এক কথায়— বিরাট।" (ডঃ মরিস বুকাইলি; বাইবেল; কোরআন ও বিজ্ঞান; পৃ-২৫৮)

18 মধু সম্পর্কেও কুরআনের বক্তব্য অনেক আধুনিক মানুষের ধারণার চেয়ে আধুনিক। এমনকি এ-কালেও অনেক কবি-সাহিত্যক উল্লেখ করেন যে, মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে। চাক ভেঙ্গে আমরা সেই মধুই পেয়ে থাকি। কুরআন কিন্তু তাবৎ বিশ্বসাহিত্যের সাথে সাংঘর্ষিক কথা বলেছে। সূরা আন্ নাহল এর ৬৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের দেহ থেকে নির্গত হয় এক ধরণের পানীয়- নানা বর্ণের। তাতে আরোগ্যকারী উপাদান আছে মানুষের জন্য।" আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় কুরআনের বক্তব্যই সঠিক। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে না; সংগ্রহ করে ফুলের রস। আর যে মধু আমরা পাই, তা হল মৌমাছির দেহনিঃসৃত রস। —অনুবাদক।

শব্দটি ব্যবহার করেছে।[19] পাঠককে এই আরবী ক্রিয়ার যথাযথ উপলব্ধি দেবার জন্য নিচের উদাহরণটি দেওয়া হল। যদি কোন লোক পানিতে থাকে এবং তার গতি সম্পর্কে 'সাবাহা' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে সাঁতার কাটছে, আপন ইচ্ছায় নড়াচড়া করছে এবং তার উপর আরোপিত কোন প্রত্যক্ষ বলের কারণে নয়। এভাবে যখন এই ক্রিয়াটি মহাশূণ্যে সূর্যের গতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি কোনভাবেই এই ইঙ্গিত বহন করে না যে, সূর্য মহাশূণ্যে সজোরে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা এরকম কিছুর ফলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছুটছে। এটি শুধু বুঝাচ্ছে যে, সূর্য চলার সময় ঘুরছে। এখন, এটিই কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু এটি আবিষ্কার করা কি কোন সহজ ব্যাপার ছিল? কোন সাধারণ মানুষ কি বলতে পারে যে সূর্য পাক খাচ্ছে? শুধুমাত্র আধুনিক কালে এমন যন্ত্র পাওয়া যায় যার সাহায্যে টেবিল কম্পিউটারে সূর্যের ছবি এমনভাবে প্রদর্শিত হতে পারে যাতে কেউ চোখে ধাঁধাঁ না লাগিয়েই দেখতে পারে। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি আবিস্কৃত হয়েছে যে, সূর্যে যে তিনটি দাগ আছে তা-ই নয় বরং এই দাগগুলি প্রতি ২৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। এই গতির উল্লেখ করা হয় সূর্যের অক্ষের উপর ঘূর্ণন হিসাবে এবং অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন যেমনটি ১৪০০ বছর আগে বিবৃত করেছিল, তেমনি সূর্য আসলেই মহাশূণ্যে ভ্রমনকালে পাক খায়।

আর একবার সঠিক অনুমানের বিষয়ে ফিরে আসুন। মৌমাছির লিঙ্গ এবং সূর্যের গতি— এই উভয় বিষয়ে সঠিক অনুমানের সম্ভাবনা চার বারে একবার!

চৌদ্দশ' বছর পেছনে তাকালে বোঝা যায়, লোকেরা সম্ভবতঃ টাইম জোন সম্পর্কে বেশি বুঝত না। এই বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য রীতিমত বিস্ময়কর। এই ধারণা যে, একটি পরিবার যখন সূর্যোদয়ের সময় নাস্তা করছে তখন অন্য পরিবার রাতের সতেজ বায়ু উপভোগ করছে এই বিষয়টি সত্যিকার অর্থে বিস্মিত হবার মত, এমনকি এই আধুনিক কালেও। বস্তুতঃ চৌদ্দশ বছর আগে কোন লোক এক দিনে ত্রিশ মাইলের বেশি ভ্রমণ করতে

19. "আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। প্রত্যেকেই আপন কক্ষপথে বিচরণ করছে।" (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত-৩৩)

পারত না; আর এভাবে, উদাহরণস্বরূপ, তার ভারত থেকে মরক্কো ভ্রমণ করতে আক্ষরিক অর্থেই কয়েক মাস লাগত। আর সম্ভবতঃ যখন সে মরক্কোয় নৈশ ভোজ করত তখন আপন মনে ভাবত, “ভারতে বাড়িতে তারা ঠিক এখন নৈশ ভোজ করছে।” এটি এই কারণে যে, সে উপলব্ধি করতে পারেনি, ভ্রমণের প্রক্রিয়ায় সে একটি টাইম জোন পার হয়ে এসেছে। তথাপি, কুরআন যেহেতু সর্বজ্ঞ আল্লাহর বাণী, সেহেতু এতে এরকম একটি বাস্তবতাকে সনাক্ত করা ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি মজার আয়াতে কুরআন বিবৃত করে যে, যখন ইতিহাস শেষ প্রান্তে এসে যাবে এবং বিচার দিবস উপস্থিত হবে, তখন এটি হবে সবকিছু ঘটার মুহূর্ত; আর ঠিক এই মুহূর্তটি কিছু লোককে পাকড়াও করবে দিবাভাগে আর কিছু লোককে রাত্রিভাগে। আয়াতটি আল্লাহর অলৌকিক জ্ঞান এবং টাইম জোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অগ্রসর জ্ঞানের সুস্পষ্ট উদাহরণ পেশ করছে এমনকি যদিও এরকম একটি আবিষ্কারের অস্তিত্ব চৌদ্দশ' বছর আগে ছিল না। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই বাস্তবতা কোন ব্যক্তির চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে কিংবা কারো অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে— এমনটি নয়। আর এই বাস্তবতা নিজেই কুরআনের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

এই উদাহরণটির ক্ষেত্রে শেষবারের মত সঠিক অনুমানের বিষয়ে ফিরে আসা যাক, কোন ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের সব ক'টিতে সঠিকভাবে অনুমান করবে— মৌমাছির লিঙ্গ, সূর্যের গতি আর টাইম জোনের অস্তিত্ব— এই সম্ভাবনা আট ভাগের এক ভাগ।

কেউ এই উদাহরণ অবশ্যই অবিরাম চালিয়ে যেতে পারেন, সঠিক অনুমানের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তালিকা প্রণয়ন করে; আর অবশ্যই অনুমান করার বিষয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অসম্ভব হবার ব্যাপারটিও উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। কিন্তু যে জিনিসটি কেউ অস্বীকার করতে পারে না তা হল নিম্নরূপঃ একজন নিরক্ষর ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) হাজার হাজার বিষয়ে নির্ভুলভাবে অনুমান করলেন, একবারের জন্যও ভুল করলেন না, সে ব্যাপারটি এত বেশি অসম্ভব যে, তাঁর কুরআনের লেখক হবার যে কোন তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হতে বাধ্য— এমনকি ইসলামের ঘোরতর শত্রুর দ্বারাও।

বস্তুতঃ কুরআন এই ধরণের চ্যালেঞ্জ প্রত্যাশা করে। সন্দেহ নেই, যদি কেউ বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে কাউকে বলে, "আমি তোমার পিতাকে চিনি। তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে", সম্ভবতঃ সে দেশের সেই লোক নবাগতের কথায় সন্দেহ পোষণ করে বলবে, "আপনি এই মাত্র এখানে এলেন। আপনি কিভাবে আমার পিতাকে চিনবেন?" ফলে, সে তাকে প্রশ্ন করবে, "বলুন, আমার পিতা কি লম্বা না খাটো? কালো না ফর্সা? তিনি কেমন লোক?" অবশ্যই, যদি নবাগত সবগুলি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে সংশয়বাদীর একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না, "আমার অনুমান, আপনি আমার পিতাকে ঠিকই চেনেন। আমি জানি না আপনি কিভাবে তাকে চেনেন, কিন্তু আমার অনুমান, আপনি তাকে চেনেন!" কুরআনের ব্যাপারেও পরিস্থিতি একই রকম। এটি ঘোষণা করে যে, এটির উৎপত্তি এমন একজনের কাছ থেকে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই প্রত্যেকের একথা বলার অধিকার আছে, "আমার বিশ্বাস জন্মান! যদি এই গ্রন্থের লেখক সত্যিই জীবন এবং আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেন, তাহলে তাঁর এটা, ওটা বা সেটা সম্পর্কে জানা উচিত।" আর অবশ্যম্ভাবীরূপে, কুরআন গবেষণার পর, প্রত্যেকে একই রকম সত্য আবিষ্কার করবে। এছাড়াও আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বিষয় জানিঃ কুরআন যা নিশ্চয়তা দিয়ে বলে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমাদের সকলের বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই। একজনের ঈমান বৃদ্ধি পায় যখন সে কুরআনের সত্যসমূহ যাচাই করে নিশ্চিত হতে থাকে। আর অনুমান করি, একজন সারা জীবনই এটি করে যাবে।

আল্লাহ্ সকলকে সত্যের সমীপবর্তী করুন। ■

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

বিস্ময়ের সেকাল

এক. উমার। আরবের এক দীর্ঘদেহী পরাক্রান্ত যুবক। হাতে খোলা তলোয়ার, চোখে আগুন, বুকের মধ্যে আক্রোশের বিষ, পেশীতে শক্তির প্রকাশ, পদক্ষেপে প্রত্যয়। মুহাম্মাদ (সা)-কে আর সুযোগ দেওয়া হবে না। চৌদ্দপুরুষের ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তিনি। অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে স্বমতে টেনে নিয়েছেন। আর সুযোগ দিলে লাত, মানাত, উজ্জার পূজা দেবার মত কেউ আর থাকবে না এ ভূখণ্ডে। অতএব তাঁর বেঁচে থাকা চলবে না। ছুটে চলেছেন উমার খোলা তলোয়ার হাতে।

পথে বন্ধু নাঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে দেখা। উমারের উগ্রমূর্তি দেখে নাঈম অবাক হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,‘ উমার! কোথায় যাচ্ছো?’

ঃ ‘মুহাম্মাদের মাথা কাটতে’, উমার জবাব দিলেন।

ঃ ‘বনী আবদে মানাফের শত্রুতা পরে করো’, নাঈমের কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রুপ, ‘আগে নিজের বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়িদকে সামলাও। তারা মুসলিম হয়ে গেছে।’

চমকে উঠলেন অমিততেজা যুবক উমার। এত বড় স্পর্ধা তাদের! তক্ষুণি ছুটলেন বোনের বাড়ির পথে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, খাব্বাব (রা) তাদেরকে কুরআন পড়াচ্ছেন।

উমার সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভগ্নিপতির উপর। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে দিলেন তাঁকে। বোন ঠেকাতে এলেন; মাথায় আঘাত করে তাকেও রক্তাক্ত করে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডার পর তারা যা পড়ছিলেন তা দেখতে চাইলেন উমার। তখন তাঁকে কুরআনের সূরা ত্বা-হা থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনানো হল। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন উমার। কোথায় সেই উগ্রতা! কোথায় সেই প্রতিশোধস্পৃহা! এতো কুরআনের অমিয়বাণীর এক মুগ্ধ শ্রোতা!

যখন তিলাওয়াত শেষ হল, তখন উমারের চমক ভাঙল। তখন তাঁর শোণিত ধারায় কুরআনের বাণীর অনুরণন। হৃদয়ে অভূতপূর্ব আলোড়ন। তাঁর কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল, ‘এ তো অতি উত্তম কথা-বার্তা’। তারপর তিনি

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুট্ দিলেন রাসূলে করীম (সা)-এর উদ্দেশ্যে। তখনো তাঁর হাতে তলোয়ার। পথচারীরা আবারো উমারকে দেখল নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটতে। কিন্তু এ এক ভিন্ন উমার; কুরআন তাঁকে একেবারেই বদলে দিয়েছে। মহানবী (সা)-এর সামনে গিয়েই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন তিনি।

দুই. যে সময় আরবদের কাব্য খ্যাতি জগতজোড়া, যে সময় আরবের নিরক্ষর গৃহিনীরাও অনর্গল কাব্য করতে পারত, সে সময় কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, "(হে রাসূল) বলে দিন, পারলে এ রকম একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" আল কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ অবতীর্ণ হবার পর কুরআনের তৎকালীন অনুসারীরা সবচেয়ে ছোট সূরা আল কাউসারের নিম্নলিখিত আয়াত দু'টি কাবা ঘরের দেওয়ালে লটকে দিয়েছিলঃ

'ইন্না আতাইনা কাল কাউসার

ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার'

সেই সাথে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল আরবের কবিদের প্রতি এর তৃতীয় পংক্তি রচনা করার জন্য । স্বভাবত:ই আরব- মনীষার মানস-পটে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছিল এই চ্যালেঞ্জ । তাঁরা চেষ্টাও করেছিলেন প্রাণপণ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, তাদের সব প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়েছিল। পরিশেষে তৎকালীন আরবের সেরা কবি লবিদ প্রথম দু'টি আয়াতের সাথে ছন্দ মিলিয়ে লিখে দিয়েছিলেন: "লাইসা হাজা মিন কালামিল বাশার'। লবিদের কথাটির অর্থ হল, 'নিশ্চয় এটা কোন মনুষের কথা নয়।' উল্লেখ্য, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

তিন. ওয়ালিদ বিন মুগিরা। কুরাইশদের বয়স্ক সর্দার। ধন, জ্ঞান, ক্ষমতা কোনটাই কম ছিল না তার। একদিন সমঝোতার জন্য সে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। রাসূল (সা) তাকে কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কুরআনের অনুপম আকর্ষণী শক্তির কাছে সে বিনম্র হয়ে পড়ে। এ খবর যখন অন্যান্য সর্দারদের কানে পৌঁছায়, তখন তারা পেরেশান হয়ে যায়। তাকে হারালে কুরাইশদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। তারা আবু জাহলকে পাঠায় ওয়ালিদকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে। এই দুই কুরাইশ নেতার মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপ ঃ

আবু জাহল ঃ চাচা! আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার জন্য কিছু মালামাল সংগ্রহ করতে চাচ্ছে।

ওয়ালিদ ঃ কেন, কি হয়েছে?

আবু জাহল ঃ আপনাকে দেবার জন্য। কারণ, আপনি মুহাম্মাদের নিকট গিয়েছেন স্বধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য।

ওয়ালিদ ঃ কুরাইশের লোকজন তো জানে যে, আমি তাদের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাহলে ধন-সম্পদে আমার প্রয়োজন কি?

আবু জাহল ঃ তাহলে আপনার গোত্রের উদ্দেশ্যে আপনি এমন একটি জোরালো বক্তব্য পেশ করুন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, আপনি মুহাম্মাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন।

ওয়ালিদ ঃ আমি কুরআন সম্পর্কে কি বলব? আল্লাহর কসম! আমি কবিতায়, গীতিকাব্যে, ছন্দে ও কাসীদায় তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। কিন্তু মুহাম্মাদের কাছে যে কুরআন শুনেছি তার সাথে এগুলোর কোন মিল নেই। আল্লাহর শপথ! তার কাছে যা অবতীর্ণ হয় তা অত্যন্ত চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর এবং তা প্রাঞ্জল ভাষায় অবতীর্ণ। তার উপরের অংশ ফলবান আর নিচের অংশ পানিসিক্ত। ওটি বিজয়ী হবার জন্য এসেছে; পরাজিত হতে আসেনি। যা তার সামনে আসে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।'

আবু জাহল ঃ যতক্ষণ আপনি কুরআনকে অবজ্ঞা না করবেন ততক্ষণ আপনার কওম আপনার উপর নারাজ থাকবে।

ওয়ালিদ ঃ আমাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দাও।'

(কিছুক্ষণ চিন্তার পর)

ওয়ালিদ ঃ এ-তো সুস্পষ্ট যাদু, তোমরা দেখো না, যে এর সংস্পর্শে যায় তাকেই তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

সত্যকে জানার পরও ওয়ালিদের তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে। সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনস্থির করেছে! (আবার বলছি) সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনস্থির করেছে! দেখেছে সে আবার ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অহংকার করে বলেছে ঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছুই নয়।'

চার. কুরাইশ সর্দাররা মহা চিন্তায় পড়ে গেছে। একের পর এক লোক মুহাম্মাদ (সা)-এর দীন গ্রহণ করছে। ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা। মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর নবদীক্ষিত অনুসারীদের উপর কতই-না নির্যাতন চালানো হচ্ছে! কিন্তু সবই নিস্ফল হচ্ছে; কোনভাবেই তাঁর দীনের বিস্তার রোধ করা যাচ্ছে

না। এমতাবস্থায় কর্তব্যকর্ম স্থির করার জন্য এক সভা ডাকা হল। নানাজন নানা পরামর্শ দিল। শেষে উত্‌বা বিন রবীয়া উঠে দাঁড়ালো।

ঃ হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমি কি মুহাম্মাদের কাছে যাবো এবং তার সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাকে কিছু প্রস্তাব দেব? সে-ও তো কোন প্রস্তাব পেশ করতে পারে আর আমরা প্রস্তাব অনুযায়ী তার চাহিদা পূরণ করব। এর ফলে সে আমাদেরকে জ্বালাতন করা থেকে বিরত থাকবে।

সবাই এক বাক্যে বলে উঠল ঃ হ্যাঁ, আবু ওয়ালীদ! আপনি তার কাছে যান আর তার সাথে কথা বলুন।

উতবা চলল মহানবীর (সা) কাছে। তাঁকে খুঁজে পেয়ে পাশে গিয়ে বসল সে।

উত্‌বা ঃ ভাতিজা! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের গোত্রের মধ্যে তোমার মর্যাদা এবং আভিজাত্যের কথা তো তোমার জানা আছে। তবে তোমার গোত্রের কাছে তুমি এমন একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে এসেছ যা দিয়ে তুমি তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। তাদের জ্ঞানী-গুণীদেরকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছ, তাদের দেব-দেবী ও ধর্মের নিন্দা করেছ আর তাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছ। আমার কথা শোন, আমি তোমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি সেগুলো ভালভাবে বিবেচনা করে দেখো। তার মধ্যে কোন একটি প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করতেও পারো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ আবুল ওয়ালিদ! বলুন, আমি শুনছি।

উত্‌বা ঃ ভাতিজা! তুমি যা নিয়ে এসেছ তার মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জন করা যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের প্রত্যেকের ধন-সম্পদের একটা অংশ আমরা তোমাকে দিয়ে দেব। ফলে তুমি আমাদের সবার চেয়ে বড় সম্পদশালী হয়ে যাবে। যদি মর্যাদা লাভ করা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা তোমাকে চিরদিনের জন্য নেতারূপে বরণ করে নেব। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতৃত্ব দেব না। তুমি যদি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে আমাদের রাজা হিসাবে বরণ করে নেব। তোমার কাছে যে অদৃশ্য আগন্তুক আসে সে যদি জ্বিন হয়ে থাকে আর তার হাত থেকে আত্মরক্ষায় তুমি যদি অক্ষম হয়ে থাকো, তবে আমরা ওঝা-কবিরাজ এনে অর্থব্যয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ এবার আমার বক্তব্য শুনুন।

উত্‌বা ঃ ঠিক আছে, বলে যাও।

রাসূল (সা) ঃ হা-মীম। এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে পরম দাতা ও দয়ালুর নিকট

থেকে। এটি একটি কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য— সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শুনেই না। তারা বলে ঃ আপনি যে বিষয়ের প্রতি আমাদের ডাকেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আর আমাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মাঝে আছে পর্দা। সুতরাং আপনি আপনার কাজ করতে থাকুন, আর আমরা আমাদের কাজ করছি। বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন, অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং আখিরাতের উপরও ঈমান রাখে না। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনো রহিত হবার নয়।

উতবা চুপ হয়ে গেল। দু'হাত পেছনে ঠেকিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে মুগ্ধ-মোহিত হয়ে গেল সে। আসমানী বাণীর সম্মোহনী শক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলল তার সমস্ত সত্তা।

মহানবী (সা) সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং আয়াতের উৎস সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন-

ঃ আপনি তো শুনলেন, হে আবুল ওয়ালিদ!

উতবা সম্বিৎ ফিরে পেল।

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি।

রাসূলুল্লাহ (সা)ঃ এবার আপনার কাজ আপনি করুন!

উতবা তার সাথীদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। ওরা বলাবলি করছিল-

ঃ আল্লাহর কসম! আবু ওয়ালীদ যে চেহারা নিয়ে মুহাম্মাদ এর কাছে গিয়েছিল, ভিন্ন চেহারা নিয়ে সে ফিরে এসেছে।

তাদের নিকট এসে বসার পর তারা বলল-

ঃ আবুল ওয়ালীদ! কী সংবাদ এনেছ?

উত্‌বা ঃ আল্লাহর কসম, আমি এমন বাণী শুনেছি যা আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটি কবিতাও নয়, গণকের মন্ত্রও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়!

তোমরা তার আনুগত্য কর আর আমাকে তার আনুগত্য করার সুযোগ দাও। ওই লোক যা করতে চায় তাকে তা করতে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার যে বক্তব্য শুনেছি তা একদিন ঘটবেই। আরবের অন্য লোকেরা যদি তাকে পরাস্ত করতে পারে, তাহলে অন্যের মাধ্যমে তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল। আর সে যদি সমগ্র আরব জাতির উপর বিজয়ী হয়, তবে তার রাজত্ব মূলতঃ তোমাদেরই রাজত্ব; তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান। তার মাধ্যমে তোমরা হবে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সম্প্রদায়। তারা বলল-

ঃ হে আবু ওয়ালীদ! আল্লাহ্‌র কসম, তার বাকচাতুর্য তোমাকে জাদুগ্রস্থ করেছে।

উত্‌বা ঃ তোমাদের কাছে এটাই আমার অভিমত। এরপর তোমরা যা ভাল মনে কর, করতে পার।

বিস্ময়ের একাল

[এখানে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি ইন্টারনেটের যে ওয়েব সাইট থেকে নেয়া হয়েছে সেটির ঠিকানা হলঃ http:// www.islam-guide. com এই ঠিকানায় বিজ্ঞানীদের মন্তব্যের ভিডিও রক্ষিত আছে। অনুবাদকের নিজের সংগ্রহেও বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকারের ভিডিও সিডি রয়েছে]

ইসলাম সব সময় ধর্ম ও বিজ্ঞানকে জময বোন ভেবে আসছে। আজ বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির কালেও তারা একত্রে আছে। তাছাড়া আল কুরআনকে ভালভাবে অনুধাবনের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এটা কোন ভাল মুসলিমের পক্ষে বিস্ময়কর না হলেও ঈমানবর্ধক তো বটেই। যে যুগে বৈজ্ঞানিক সত্য অনেক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত ধসিয়ে দিচ্ছে, ঠিক সেই যুগেই বিজ্ঞান কুরআনের বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা করে তার উৎসের অলৌকিকত্ব (Divine Origin) স্বীকার করে নিচ্ছে।

দশ বছর ব্যাপী গবেষণার পর বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলী[1] ১৯৭৬ সালে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তব্যের

---

1. ডঃ বুকাইলি তাঁর কর্মজীবনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জিক্যাল ক্লিনিকের প্রধান ছিলেন। তিনি একটি বহুল বিক্রিত (বেস্ট সেলার) গ্রন্থ The Bible, the Quran and Science (1976) এর রচয়িতা। তাঁর অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ হল- What is the Origin of Man, Moses and Pharaoh: the Hebrews in Egypt, Reflexions sur le Coran, Mummies of the Faraohs- Modern Medical Investigations. সর্বশেষ গ্রন্থটির জন্য তিনি Academie Francaise থেকে History Prize লাভ করেন। আরেকটি জাতীয় পুরস্কার পান French National Academy of Medicine থেকে।

তুলনামূলক আলোচনা করেন। আলোচনার উপসংহার হল, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এই গ্রন্থটির বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়। শরীরতত্ত্ব এবং প্রজনন বিদ্যার উপর তিনি যে গবেষণা করেছিলেন, উক্ত ভাষণে তা তিনি তুলে ধরেন:

"Our knowledge of these disciplines is such, that it is impossible to explain how a text produced at the time of the Quran could have contained ideas that have only been discovered in modern times."

অর্থাৎ— 'এই বিষয়গুলিতে আমাদের জ্ঞান এমন যে এগুলি আবিস্কৃত হয়েছে কেবল অধুনিক কালে। অথচ কুরআনের সময়কালের কোন পাঠ্যে কিভাবে এটা অলোচিত হল— তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।'

তাছাড়া ডঃ বুকাইলি তাঁর বেস্ট সেলার The Bible, the Quran and Science গ্রন্থে বলেন ঃ

"The Quran does not contain a single statement that is assailable from a modern scientific point of view."

অর্থাৎ— কুরআনে এমন একটি বক্তব্যও নেই যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণযোগ্য হতে পারে।

এর কিছুকাল পরের কথা । ডঃ কীথ এল, মূর[2] কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়টি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসেন। তাঁকে সেই বক্তব্যগুলো পড়তে দেওয়া হয়, যাতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন, ভ্রূণ গঠন এবং ভ্রূণের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন ধাপ আলোচিত হয়েছে। এতে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেনঃ

"It has been a pleasure for me to help clarifying statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later."

---

2. ডঃ কীথ এল. মূর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি এবং অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এমেরিটাস। তিনি স্বনামধন্য ভ্রূণতত্ত্ববিদ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তকের প্রণেতা। তাঁর রচিত বিখ্যাত পাঠ্য পুস্তক হল-Clinically Oriented Anatomy (3rd edition) এবং (The Developing Human 5th edition, সহ লেখক টি ভি এন পার্সড) । ডঃ মূর কানাডীয় এনাটমিস্ট সমিতি এবং আমেরিকান ক্লিনিক্যাল এনাটমিস্ট সমিতির সাবেক সভাপতি। কানাডীয় এনাটমিস্ট সমিতি তাঁকে সম্মানজনক J.C.B. Grant পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৯৪ সালে তিনি ক্লিনিক্যাল এনাটমির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আমেরিকান ক্লিনিক্যাল এনাটমির সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন।

অর্থাৎ— "মানুষের বেড়ে ওঠা সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারায় আমি আনন্দিত। এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে, এই বক্তব্যগুলি মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট খোদা বা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। কারণ, এই জ্ঞানের প্রায় সবটাই অনেক শতাব্দী পরে ছাড়া আবিষ্কৃত হয়নি।"

অধ্যাপক মূর তাঁর এই নব উপলব্ধি বেশ কিছু আলোচনা সভায় বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থাপন করেন। কিছু কানাডীয় সাময়িকপত্র মূরের এতদসংক্রান্ত অনেক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। এখানেই শেষ নয়। ডঃ মূর কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ের উপর তিনটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান করেছেন। এসব অনুষ্ঠানে তিনি ১৪০০ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ কুরআনের বক্তব্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গতি তুলে ধরেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "এটার অর্থ কি এই যে, আপনি কুরআনকে স্রষ্টার বাণী বলে বিশ্বাস করেন?" জবাবে তিনি বলেন, "I find no difficulty in accepting this." (এটা মেনে নিতে আমি কোন অসুবিধা দেখি না)।

কুরআনের ভ্রূণতত্ত্ব আরেকজন বিজ্ঞানীকে অভিভূত করে। তিনি হলেন থাই বিজ্ঞানী অধ্যাপক তেজাতাত তেজাসেন।[3] তিনি বলেনঃ

"From my studies and what I have learnt at this conference I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true. That can be proved the scientific way."

অর্থাৎ— "আমার অধ্যয়ন থেকে এবং এই আলোচনা সভায় আমি যা জেনেছি তার ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি যে, ১৪০০ বছর আগে কুরআনে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা সবই সত্য। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা প্রমাণ করা যায়।"

আরেকজন প্রাণিবিজ্ঞানীর কথায় আসা যাক। ইনি-ই, মার্শাল জনসন।[4] আল কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক বর্ণনা পড়ার পর তিনি এ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং মন্তব্য করেনঃ

"The Quran describes not only the development of external form but emphasizes also the internal stages–the stages inside

---

3. অধ্যাপক তেজাসেন থাইল্যান্ডের চিয়াং মেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তিনি মেডিসিন অনুষদের ডীনের দায়িত্বও পালন করেন।

4. প্রফেসর জনসন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি ও বিকাশ জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তাছাড়া তিনি দানিয়েল বাউ ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তাঁর ২০০শ'রও বেশি প্রকাশনা আছে। তিনি টেরাটোলজি সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science... If I was to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things that were described, ...so I see nothing in conflict with the concept that Divine intervention was involved."

অর্থাৎ— "কুরআন শুধু ভ্রূণের বাইরের গঠন বর্ণনা করেনি বরং ভ্রূণের সৃষ্টি থেকে বেড়ে ওঠার সময়ে পরিলক্ষিত আভ্যন্তরীন বিভিন্ন ধাপও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছে। এটি করতে গিয়ে প্রধান ঘটনাগুলি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত। আমি নিজেও যদি সেই যুগে ফিরে যেতাম, আজ যা জানি এবং বর্ণনা করতে পারি সেই জ্ঞান নিয়েও বিষয়গুলি আমি ঐ ভাবে বর্ণনা করতে পারতাম না যেভাবে (কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এই ধারণার সাথে কোন বিরোধের অবকাশ দেখি না যে, আসমানী মধ্যস্থতা জড়িত ছিল।"

জো লেই সিম্পসন। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ-ওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তাছাড়া তিনি আমেরিকান ফার্টিলিটি সোসাইটির প্রধান। তিনি অনেক সম্মাননা লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Association of Professors of Obstetrics and Gynaecology Public Recognition Award-1992. কুরআনে ভ্রূণ সম্পর্কিত তথ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবার পর মন্তব্য করেনঃ

"It follows that not only is there no conflict between genetics and religion (Islam) but in fact religion may guide science by adding revelation to some of the traditional scientific approaches ... there exist statements in the Quran shown centuries later to be valid which support knowledge in the Quran having been derived from God."

অর্থাৎ— "বংশগতি ও ধর্মের (ইসলাম) মধ্যে কোনই বিরোধ নেই। শুধু তাই নয়, বরং কিছু ঐতিহ্যবাহী বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাথে ওহীর সম্মিলনের মাধ্যমে ধর্ম বিজ্ঞানকে দিক-নির্দেশনা দান করে। আর কুরআনে এমনও বক্তব্য রয়েছে যা শত শত বছর পরও যথার্থ প্রমাণিত হচ্ছে এবং যা এই দাবীকে সমর্থন করে যে, কুরআনের জ্ঞান আসমানী উৎস থেকে প্রাপ্ত।"

এতক্ষণের আলোচনা কারো মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিতে পারে যে, কুরআন বুঝি শুধু ভ্রূণ বিকাশের কথাই বলে যদিও গ্যারি মিলারের প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, আল কুরআন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। এখন বিজ্ঞানের

অন্যান্য দিক-বিভাগের কিছু দিক্‌পালের আল কুরআন সম্পর্কিত মূল্যায়ন উল্লেখ করা হচ্ছে।

টোকিও মানমন্দিরের পরিচালক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউশিদি কুসানকে আল কুরআনের কিছু আয়াত পড়তে দেওয়া হয়। এই আয়াতগুলিতে মহাবিশ্বের সূচনা, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, তার সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে কারীমা পাঠ করে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

তিনি বলেন ঃ "I say, I am very much impressed by finding true astronomical facts in the Quran, and for us modern astronomers have been studying very small of the universe. We have concentrated our efforts for understanding of very small part. Because by using telescopes, we can see only very few parts of the sky without thinking about the whole universe. So by reading the Quran and by answering the questions, I think I can find my future way for investigation of the universe."

অর্থাৎ— "বলতে কি, কুরআনে সত্যিকার জ্যোতির্বিদ্যার তথ্য পেয়ে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি আর আমাদের জন্য আধুনিক জ্যেতির্বিদরা গবেষণা করে চলেছেন মহাবিশ্বের খুব ছোট অংশ নিয়ে। আমরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছি খুব সামান্য অংশ অনুধাবনের জন্য। কারণ, দূরবীণ ব্যবহার করে আমরা মহাবিশ্বের শুধু অতি সামান্য অংশ দেখতে পাই, সমগ্র মহাবিশ্বের কথা কল্পনাই করা যায় না। কাজেই আল কুরআন অধ্যয়ন করে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে, আমি মনে করি আমি মহাবিশ্ব গবেষণার ভবিষ্যৎ খুঁজে পেতে পারি।"

আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথায় আসা যাক। ইনি হলেন অধ্যাপক আর্মস্ট্রং। যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেতির্বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তিনি। বর্তমানে তিনি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র NASA-তে কর্মরত আছেন। যে বিষয়ে অধ্যাপক আর্মস্ট্রং বিশেষজ্ঞ, সেই বিষয়ে আল কুরআনের যে সব আয়াত আছে, সেসব তাঁকে সরবরাহ করা হয়। সেগুলি যখন তিনি পড়ে শেষ করেন তখন তাঁকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "মানুষের নির্মিত আধুনিক যন্ত্রপাতি যথা রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে আপনি নিজে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সঠিক প্রকৃতি দেখেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন। আপনি এটাও দেখেছেন কিভাবে এই একই ধরণের তথ্য চৌদ্দশ' বছর আগে

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আপনার অভিমত কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ

"That is a difficult question which I have been thinking about since our discussion here. I am impressed at how remarkably some of the ancient writings seem to correspond to modern and recent astronomy. I am not a sufficient scholar of human history to project myself completely and reliably into the circumstances that 1400 years ago would have prevailed. Certainly, I would like to leave it at that, that what we have seen is remarkable, it may or may not admit of scientific explanation, there may well have to be something beyond what we understand as ordinary human experience to account for the writings that we have seen."

অর্থাৎ— "এটি একটি কঠিন প্রশ্ন যা নিয়ে আমি ভাবছি এখানে আমাদের আলোচনার সময় থেকে। কিভাবে কতক প্রাচীন গ্রন্থ আধুনিক ও সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা ভেবে আমি প্রভাবিত হই। মানবেতিহাসের উপর আমার তেমন পাণ্ডিত্য নেই যাতে আমি নিজে ১৪০০ বছর আগে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারি। নিঃসন্দেহে, আমি এটাকে সেই দিকে ছেড়ে যেতে পছন্দ করি, আমরা যা দেখেছি তা উল্লেখযোগ্য। এটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাক বা না থাক, সেই রচনার (কুরআনের) উৎস সম্পর্কে বলতে হয়, আমরা যা দেখেছি তাতে মানবীয় অভিজ্ঞতা বলতে যা বুঝায় তার বাইরেও কিছু বোধহয় ছিল।"

এবার একজন সমুদ্র-বিজ্ঞানীর মন্তব্য শোনা যাক। ইনি হলেন উইলিয়াম হে। যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক তিনি। অধ্যাপক হে হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিচিত সমুদ্রবিজ্ঞানীদের একজন। আল কুরআনের সমুদ্র সংক্রান্ত আয়াতগুলি তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি গভীর মনযোগ সহকারে সেসব পাঠ করেন। সমুদ্রের উপরিভাগ, ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন সমুদ্রের মধ্যকার ভেদক, সমুদ্রের তলদেশ এবং সমুদ্র ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হয়। সেগুলির জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the holy Qur'an, and I have no way of knowing where they would have come from. But I think, it is extremely interesting that they are there."

অর্থাৎ— "আমার কাছে এটি খুব মজার ব্যাপার যে, পবিত্র আল কুরআনের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে এই ধরণের তথ্য আছে, আর আমার জানার কোন উপায় নেই সেগুলি কোত্থেকে এসেছে। কিন্তু আমি মনে করি এটি খুবই মজার ব্যাপার যে, এগুলি তাতে (অর্থাৎ বইটিতে) আছে।"

যখন তাঁকে কুরআনের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি জবাব দেন, "well, I would think it must be the divine being." (বেশ, আমি মনে করি এটি নিশ্চয় আসমানী বস্তু)।

অধ্যাপক সিয়াবেদা আরেকজন সমুদ্র-বিজ্ঞানী। তিনি জাপানের একজন বিখ্যাত সমুদ্র-ভূতত্ত্ববিদ। তাঁকে পড়ে শোনানো হয় পর্বত সম্পর্কিত আল কুরআনের আয়াত ও হাদীস। এসব শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান। তিনি মন্তব্য করেন ঃ

"I think it seems to me very, very mysterious, almost unbelievable. I really think if what you have said is true, the book is really a very remarkable book, I agree."

অর্থাৎ— "আমি মনে করি এটি আমার কাছে খুব, খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে, প্রায় অবিশ্বাস্য। আমি সত্যিই মনে করি, যদি আপনি যা বলেছেন সত্যি হয়, তাহলে গ্রন্থটি আসলেই খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, আমি স্বীকার করছি।"

এ হল চৌদ্দশ' বছরের এক প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে একবিংশ শতাব্দীর কিছু বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন। এঁরা সবাই আল কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য পাঠ করে বিস্মিত হয়েছেন। বিজ্ঞানের জগত যা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি [যেমন শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র, মহাশূণ্যে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, সাবমেরিন, কম্পিউটার ইত্যাদি] ব্যবহার করে জানতে পেরেছে, তা সেই পুরাকালের এক নিরক্ষর মরুচারী কিভাবে জানলেন, কোত্থেকে জানলেন— এটা তাঁদেরকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। তাঁরা সবাই অকপটে স্বীকার করেছেন, এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, এটি এমন কোন সত্তার নিকট থেকে এসেছে, যাঁর কাছে কোন কিছুই অজানা নয়। তিনি আমাদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহ। ■

সমাপ্ত